মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

দি বুক সিণ্ডিকেট
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ, মহালয়া, ১৩৫৫

প্রকাশক :

ভূপেশ গুপ্ত

একক সাহিত্য সম্প্রদায়

৪৪৬।১ কালিঘাট রোড

কলিকাতা

প্রচ্ছদপটশিল্পী

মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রাকর

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ম্যাগনেট প্রেস

৩৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট

কলিকাতা

দাম : দু' টাকা।

মায়া-কে

বইখানির অধিকাংশ গল্পই আমার ষোল থেকে বাইশ বৎসর বয়সের ভিতরের রচনা। এর প্রত্যেকটি লেখাই বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে এগুলি পুস্তকাকারে গ্রথিত করে' প্রকাশ করবার অশেষ ক্লেশ বরণ করলেন—বুক সিণ্ডিকেট। সেই বুক সিণ্ডিকেটের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত বিজন মুখোপাধ্যায়কে তাই সর্বাগ্রে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। গল্পগুলির সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নানা দিক দিয়ে সাহায্য—বইখানির প্রকাশের ব্যাপারে যা ছিল অপরিহার্য, সেটুকু সম্পন্ন করেছেন কবি ভূপেশ গুপ্ত। সেকারণে তাঁরও ঋণ অনস্বীকার্য। ম্যাগনেট প্রেসের শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও সাধুবাদ জানাই। যেহেতু তাঁর স্বয়ংসিদ্ধ সৌজন্য সীমাহীন এবং স্মরণীয়। সর্বশেষে যে যে পত্রিকা থেকে গল্পগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সেই সব পত্রিকার সুধী সম্পাদকবৃন্দকেও এই সুযোগে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে আনন্দিত হচ্ছি।

বইখানিকে সম্পূর্ণ মুদ্রণত্রুটিহীন করে' তোলারই আয়োজন ছিল সর্বাধিক। কতদূর সফল হওয়া গেছে জানি নে। তবু আশা করা যায় যে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার ক্ষমাসুন্দর-দৃষ্টিতে এ-অক্ষমতাই হবে না লেখকের একমাত্র পঙ্গুতার নিদর্শন!

১৬।২, কুমেদান বাগান লেন,
পোঃ—পার্ক ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১৬

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বুকের ব্যথা

কালিঘাট ট্রাম-ডিপোর কিছু দূরে গেলেই একটা বিস্তৃত সোজা গলি দেখতে পাওয়া যায়। ওরই মধ্যে একটা দোকান ঘরের মতো সাম্নের খোলার ঘরে শুয়ে থাকে অনুপম। বয়স দূর থেকে দেখলে ঠিক বোঝা যায় না, মনে হয় পঞ্চাশেরও বেশী; কিন্তু আসলে তার বয়স হবে সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ। জীবনের ওপর দিয়ে দীর্ঘ দিন ধ'রে এক অশ্রান্ত ঝড় উড়ে গিয়ে তাকে ক'রে দিয়েছে ক্ষীণ—দুর্বল, শয্যাশায়ী। মুখে হয়েছে বড় বড় দাড়ি। মাথার চুলগুলো মাঝে মাঝে পাকা। চোখ দু'টো গেছে কোথায় সেঁধিয়ে। মাঝে মাঝে তা থেকে গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে দু'চার ফোঁটা অশ্রু। ...যক্ষ্মায় তার জীবন-প্রদীপ স্তিমিত প্রায়। মাঝে মাঝে সে পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে।...সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রক্ত উঠে তার কথা বন্ধ ক'রে দেয়।

শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে সেদিন উঠলো ঝড়।—দারুণ ঝড়। মিনিট দু'এক এর মধ্যে বড় বড় বাড়ীর জানালাগুলো দুম দাম শব্দ ক'রে উঠলো। দূরের নারকেলগাছ গুলোয় শত শত দৈত্য এসে

যেন ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিলে। ট্রাম-ডিপোর খানিকটা দূরে একটা অশ্বত্থ গাছ যেন মর্ম-বেদনায় ডাল-পালা নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তে লাগলো। রাস্তায় যেখানে যত ধূলো সব উড়ে ছড়িয়ে পড়লো বাড়ী বাড়ী। অনুপমের খোলার ঘরের জানালাটা খোলা ছিল। সোঁ সোঁ করে এক ঝলক ঝড় এসে প্রদীপটাকে দিলে নিবিয়ে।······খানিকটা পরেই এল বৃষ্টি।······চম্‌কালো বিদ্যুৎ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল প্রলয়রূপে একটা বজ্র···কড়-কড়-কড়-কড় কড়াক্! অনুপম চম্‌কে উঠে স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো টপ করে বিছানায় বসে পড়ে চীৎকার করে উঠলো,—টেম্‌পেষ্ট! বুড়ী মা···আলো জ্বালো ···শীগ্‌গির···শীগ্‌গির···মারা গেলাম···ওঃ মারা গেলাম···কোথায়, সরা কোথায়,···রক্ত···রক্ত!···

বুড়ী মা তখনি জেগে উঠেছে। তারি ঘর এটা। সকালে তেলেভাজা ভেজে, দুপুরে দাসীবৃত্তি করে কোনো রকমে সে, দিন গুজরান করে। তার একটি ছেলে ছিল—ঠিক অনুপমেরই মতো। কলে কাজ করতে গিয়ে দু' বৎসর হ'ল অপঘাতে মারা গেছে। সে শোক বুড়ী-মা বুকে ধারণ ক'রে এখনো বেঁচে আছে অসহ্য ব্যথা নিয়ে। ক'দিন হ'ল অনুপমকে ভিখারী অবস্থায় দেখে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে। এই যেন তার হারানিধি···তার সান্ত্বনা। কিন্তু এই-ই বা বাঁচে কৈ?

বুড়ীমা কম্পিত-হস্তে দেশলাই হাতড়াতে হাতড়াতে বল্লে—হাঁ বাবা, জ্বালছি, জ্বালছি·· কৈ, কোথায় আবার গেল দেশলাইটা!

অনুপম রক্তটা 'থু' করে ফেলে দিয়ে মাথাটা টিপে বিরক্ত-কণ্ঠে বল্লে,—মরুক্‌গে দেশলাই···আগে মাথার শিয়রের জানালাটা বন্ধ কর···জলে বিছানা যে ভিজে গেল!

বুড়ীমা তৎক্ষণাৎ কাঁপতে কাঁপতে ঠাওর ক'রে ক'রে গিয়ে

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপরই খুঁজে হাতের কাছে পেলে দেশলাইটা। খুব সন্তর্পণে নিয়ে আবার প্রদীপটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বারুদের ওপর কাটিটা ঘস্‌তে লাগলো। কিন্তু দেশলাইটা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় আলো বেরুলো না।

একটা ধেড়ে ইঁদুর অনুপমের কোলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। অনুপম বিরক্ত হ'য়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো,—কী হল বুড়ীমা? ···দেশলাই জ্বালতে তোমার দু' ঘণ্টা লাগে?

বুড়ীমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্লে,—জ্বালছি তো বাবা, দেশলাই ভিজে গেছে কি না!

···খানিকটা পরে আবার প্রদীপটা জ্বলে উঠলো।

বুড়ীমা দরজায় ভাল করে খিল আঁটা হয়েছে কি-না, পরীক্ষা ক'রে নিজের খাটিয়ায় ফিরে আস্‌তেই আবার বাইরে পড়লো—বজ্র। আকাশটা প্রলয়ের বিকট শব্দ ক'রে উঠলো···

একটা উন্মত্ত ঝড় জানালাটায় আছড়ে প'ড়ে আবার ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার শব্দ—গুড় গুড় গুড় গুড় গুড়ুম! যেন রুদ্র দেবতা বিষাণের কামান দাগছে!

অনুপম উ—উঃ ক'রে মাথাটা টিপে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে উঠলো,—বুড়ী মা, বুড়ী মা, আমার জীবনের শেষ হ'য়ে এসেছে! আমি বাঁচবো না—আমি বাঁচবো না, আর পারছি না!···আজ বুকের বোঝা তোমার কাছে নামিয়ে দোবো মা, তুমি আমার অনেক ক'রেছ···মা,···মা···

বুড়ী আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে—কথা বলিস নি···অসুখ বাড়বে!

অনুপম কথা শুনে হেসে উঠলো—একটা মুমূর্ষুর হাসি! তারপর দৃঢ় অথচ উচ্চস্বরে বল্‌তে লাগলো,—আজ কথা বল্‌তেই হবে মা।

আমার ডাক পড়েছে ;...আকাশ আমায় ডাক্‌ছে...বজ্র আমায় আহ্বান ক'চ্চে...গভীর-রাত্রি আমায় হাতছানি দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'চ্চে। মা, আমায় যেতে-ই হবে। যেতে হবে কত পর্বত উল্লঙ্ঘণ ক'রে—কত সমুদ্র-নদী নালা-বন-জঙ্গল পিছনে ফেলে, কত সাহারা-প্রান্তর-জনপদকে অবহেলা ক'রে। মা, সৃষ্টির আলো নিবে যাবে আমার চোখে. ইন্দ্রিয় আর...

তার কথা আটকে গেল।

বুড়ীমা উচ্ছ্বসিত-অশ্রু দমন ক'রে বল্লে,—কী বক্‌ছিস্ যা-তা বাবা ? ... নে, ঘুমো, পাগলের মতো বকিস্ নি !

অনুপম বুড়ীমার হাত দু'টোকে বুকের উপর চেপে রেখে বল্লে,—পাগল আমি নই মা, পাগল আমি নই। আমার অন্তরের অন্তর্যামীকে সাক্ষী ক'রে এখনও বল্‌তে পারি, আমি সজ্ঞান ! বুড়ীমা, আমার জীবনের ইতিহাস শুন্‌বে ?...শুন্‌বে মা ?

মা বলে ডাক্‌লে বুড়ীর অশ্রু রোধ মান্‌তো না। তাই এখনো মান্‌লে না।...বুড়ী বল্লে,—বল।

অনুপম একটু উঠতে চেষ্টা কর্‌ল। কিন্তু বুড়ীমা বাধা দিয়ে তার বুকে হাত বুলুতে লাগলো।

অনুপম ব'লে যেতে লাগলো,—বয়স তখন আমার কুড়ি-একুশ হবে মা।...এম-এ পড়তাম ! একটী মেয়ে—রূপে-গুণে সবেতেই চমৎকার ! নাম তার অণিমা, তাকে আমি ভালোবেসে ফেল্লাম। সে যে কী ভালোবাসা, তা আমি বল্‌তে পার্‌বো না মা ! প্রত্যেক দিন তাকে না দেখলে আমার মন অস্থির হ'য়ে উঠতো।...সেও আমায় ভালোবাস্‌তো —একেবারে অন্তর দিয়ে। আজকালকার নভেল-নাটকের সস্তা ভালো-বাসা সে জান্‌তো না।...আমি একদিন তাকে বিয়ে কর্‌তে চাইলাম। তার বদ্‌মেজাজী বাবা বল্লেন,—সিভিলিয়ান না হ'লে আমার মেয়ের সঙ্গে কারো বিয়ে দোব না। কথাটায় ভীষণ আঘাত লাগলো।

অণিমাকে বল্লাম। অণিমা বল্লে, বেশ তো, তুমিও না হয় সিভিলিয়ান হ'য়ে এসো না। আমি বল্লাম, তুমি এতদিন অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে ? অণিমা কেঁদে বল্লে, তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর না ? কথাটায় আমি লজ্জিত হ'লাম। তারপর-ই বাবাকে ব'লে ক'য়ে বিলাত যাই। কিন্তু বাবার একান্ত ইচ্ছা ছিল না, আমাকে বিলাত পাঠাবার। তাই, তিনি যাবার সময় আমার হাত দু'টো ধ'রে কেঁদে বল্লেন,—বাবা, না গেলে-ই পার্‌তে !···কাজটা ভালো হ'চ্ছে না।···আমি চেয়েছিলাম— তুমি আমার একটী ছেলে—বাড়ীতে নজরে থাক্‌বে—বেশ একটী সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দোব, কিন্তু···যাও, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তুমি উন্নতি কর ; ··তবে আমার ভয়—বুড়ো হ'য়েছি·· কোন্ দিন···

আমি তখন অণিমার জন্যেই উদ্‌গ্রীব। বাবাকে বল্লাম,—ও রকম ব'লো না বাবা ··আবার আস্‌বো, তুমি মর্‌বে না···মর্‌তে পার না···

বাবা হেসে বল্লেন,—বোকা ছেলে, দুনিয়ায় কেউ কখনো অমর হ'তে পারে রে ?

যাক্ ,বিলাত গেলাম। · দু বৎসর বাবা বেশ টাকা পাঠালেন কিন্তু তারপরই একদিন একখানা চিঠি গেল—বাবা পরলোকে ! মাথায় যেন আমার বজ্র পড়লো !···চোখে ধোঁয়া দেখলাম ! তারপর, কোথায় যে কী হ'ল, কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না,—এক খুনের মামলায় শেষে আমি পড়লাম জড়িয়ে। কাকে আর বল্‌বো, ১৪ বৎসর হ'ল আমার দীপান্তর। ১৪ বৎসর। জীবনের যেন সবটুকু আশা গেল বালির বাঁধের মতো ভেঙ্গে ! সেখানে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌তাম,—ভাবতাম, আজো বুঝি অণিমা আমার আশায় আশায় ব'সে আছে ! আজো বুঝি সে আষাঢ়ের মেঘ দেখে "মেঘদূতের" কল্পনা করে···আজো বুঝি সে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আমার আসা-পথ চেয়ে ব'সে থাকে !

ভাবতাম, অণিমা বুঝি আমার সমস্ত জগৎ···আমার সমস্ত দেহ···

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়! আকাশটা যখন তারায় তারায় ছেয়ে যেত, আমি ভাবতাম বুঝি ওদের মধ্যেই অণিমা একটা তারা হ'য়ে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে; জ্যোৎস্নায় যখন বনে-বনে অপূর্ব শিহরণ জাগত, আমি ভাবতাম, অণিমা বুঝি তার মধ্যে থেকে ব'লছে—ওগো ফিরে এস, ফিরে এস বন্ধু, আমি আর তোমার অপেক্ষায় থাকতে পাচ্ছি না! সমুদ্র-জলে যখন ব্যথা-হত উর্মিগুলো ফেনা নিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে তীরে এসে ছড়িয়ে পড়তো, আমি তখন ভাবতাম, বোধ হয় অণিমা ওদের মধ্যে থেকে বুকের বেদনা দিয়ে রচনা করা একটা প্রণতি পাঠিয়ে দিচ্ছে! ওঃ···বুড়ী মা!···

অনুপম হাঁপাতে লাগলো। তারপর আবার সুরু ক'রলে,—এই দেখ, হাতে একটী আংটী,···এটা আজো রেখে দিয়েছি·· অণিমার আংটি! সেই সুদীর্ঘ-কাল ধরে এ আমায় তৃপ্তি দিয়েছে!···যাক্, বহুদিন প'রে আবার ফিরে এলাম এই কলকাতায়।···ভাবলাম, এমন অসহায় হ'য়ে এখন যাই কোথা? বাড়ী নেই—বাবা নেই—মা নেই, কোথায় যাব?··· অণিমার কাছে? তার কি মনে আছে এখনো আমাকে? এখনো কি সে অপেক্ষা ক'রে আছে এক খুনীর জন্যে? তা হয় না। বাংলা দেশের মেয়েরা পরাধীন। ইচ্ছা করলেও পারে না। তার বাবা তার বিয়ে দিয়েছেন নিশ্চয়ই। এখন হয়তো তার সে-মোহ ঘুচেছে। কিন্তু তবুও মন মানে না। আশা—তার বাবার বাড়ীর দরজায় টেনে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি, বাড়ীর সামনে টাঙানো র'য়েছে একটা মস্ত বড় সাইনবোর্ড—লেখা আছে, বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে···। হতাশ হলাম। কোথায় খুঁজবো? রাস্তায় পাগলের মতো চলতে লাগলাম। হঠাৎ এক জায়গায় এসে ব'সে পড়লাম। কাশতে কাশতে উঠলো রক্ত···বুঝলাম যক্ষ্মা হ'য়েছে। তা হ'ক—চ'লে এলাম কালিঘাটে। ভিখারীদের কাছটায় ব'সে প'ড়লাম। হঠাৎ দেখি—অণিমার মতো ঠিক একটী বৌ

—ঠিক অবিকল তারই মতো, গরীব-দুঃখীদের আধলা বিতরণ ক'চ্চে। পাছে আমায় ভিখারী ভেবে কিছু দিয়ে ফেলে এই ভেবে আমি স'রে গেলাম! তারপর দূরে থেকে লক্ষ্য ক'র্‌লাম—সেই বৌটী খানিকটা পরে মোটরে উঠলো।—সঙ্গে তার দু'টী মেয়ে, আর একজন যুবক··· বোধহয় তার স্বামী···বেশ সুপুরুষ দেখতে! আমার মনে হয়—অণিমা আমায় ভুলে গেলেও আমি তাকে ভুলি নি—বেশ চিন্‌তে পেরেছি।··· তারপর তুমি আমায় এক সময় তোমার ঘরে নিয়ে এলে বুড়ী মা!

অনুপম আর বল্‌তে পার্‌লে না। আবার আরম্ভ হল—তার কাশি। রক্ত উঠলো খানিকটা।

বুড়ীমা আকুল হ'য়ে একটা গামছা দিয়ে তার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বল্লে,—আর থাক্, আমি বুঝেছি, বুঝেছি অণিমা কে···

মুগ্ধ-বিস্ময়ে বুড়ীমা থেমে পডলো।

অনুপম উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো।—তুমি জানো, তুমি জানো বুড়ী-মা, কে সে?

জানি বাবা জানি, তারি বাড়ী তো আমি কাজ কর্‌তে যাই;— বুড়ীমা বল্লে।

অনুপমের চোখ দু'টো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। ওঠবার সে একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বল্লে, সত্যি বল্‌ছো বুড়ীমা?···তার বাড়ী···তার বাড়ী কোথায়?···আচ্ছা···আচ্ছা, আমার আংটীটা নিয়ে দেখিয়ো তো, এটা কি তার?—আংটীটা সে খুলে দিয়ে দিলে।

বুড়ীমা বল্লে,—দেখাবো বাবা, তোমার কথা সে আমায় একদিন বলেছিলো, আমি কিন্তু তোমায় দেখে অত খেয়াল কর্‌তে পারিনি;··· তার বাড়ী বেশী দূরে নয়···একটু গেলেই···

অনুপম আনন্দে ব'সে প'ড়ে। বুড়ীমার হাত দু'টো ধ'রে ফেল্লে।

—সত্যি, এখনো তার মনে আছে তা হ'লে মা? আচ্ছা, আমায়

তুমি সেখানে নিয়ে যেতে পার? পরক্ষণেই অনুপম কি ভাবলে। তারপর বলে উঠলো,—না, মা, আমি চাই না যেতে। তার শান্তির সংসারে আমি আর ধূমকেতু হব না।—সে সুখে থাক, সে সুখে থাক।

একটু থেমে সে বল্লে,—আচ্ছা মা, সে সুখে আছে ত'?

বুড়ীমা এতক্ষণ কি ভাবছিলো। বল্লে,—ঠিক বুঝতে পারি না বাবা—বিয়ে সে আগে করতে চায় নি, তারপর এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েও যেন কেমন কেমন···

অনুপম শুনে চীৎকার ক'রে উঠলো।—না মা, বুঝিয়ো তাকে, স্বামী তার গুরু—স্বামীকে যেন সে যত্ন করে। আমার জীবন তো ব্যর্থ হ'য়ে গেছে কিন্তু তার যেন···

বাইরে আবার একটা বজ্র পড়লো। বৃষ্টি তখন মুশলধারে ঝরছে।

অনুপম শুয়ে বল্লে—বুড়ীমা, একটা কথা রাখবে? গলার স্বরে তার মিনতি।

বুড়ীমা চোখের জল মুছে বল্লে,—রাখবো বাবা, বল, তুই যে আমার ছেলে!

অনুপম খুব ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগলো,—আমি মারা গেলে তুমি তাকে বলো, অনুপম আশীর্বাদ ক'রে গেছে—তাকে, তার মেয়ে দুটীকে, তার স্বামীকে। সে যেন পূর্বের সমস্ত কথা ভুলে যায়;—যেন রাত্রির স্বপ্নের মতো সে আমাকে ভুলে যায়—যেন তীর্থের যাত্রীর মতো সে আমাকে ভুলে যায়—যেন সুদূর অতীতের গোধূলির মতো সে আমাকে ভুলে যায়। আর ঐ আংটীটা দিয়ো মনে ক'রে—সে যেন ও'টা ফেলে দেয়।

বুড়ীমা চোখের জল ফেলে বল্লে, যা বল্‌ছিস বাবা, সব ক'র্‌বো।··· এখন ঘুমো।

সকাল হতেই অনুপমের বিছানার পাশে একটা ডাক্তার এসে হাজির

হ'ল। অনুপম ক্ষীণ-কণ্ঠে বল্লে,—ডক্টর! মাই ফ্রেণ্ড। নো নিড···আই নো মাই পাল্‌স্ বেটার দ্যান ইউ!

ডাক্তার হাস্‌লে। তারপর শরীর টিপে-টাপে দেখে······বিদায় নিলে।

খানিকটা পরেই বুড়ীমা এসে ঘরে ঢুকলো। তার কোলে ফুটফুটে একটি সুন্দরী মেয়ে।

অনুপম বুড়ীমাকে বল্‌তে যাচ্ছিল, কেন আর শেষ সময়ে মিছামিছি পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডেকে আনা, কিন্তু মেয়েটীকে দেখে সে-কথা সে বল্‌তে ভুলে গেল। খুব আগ্রহের সঙ্গে বল্লে—কে মেয়েটী?······বুড়ীমা একটু হেসে বল্লে,—তারই।

অনুপম আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলো। —তারি? কি করে আন্‌লে?······দেখি।

বুড়ীমা কোন কথা না ব'লে অনুপমের কোলে তাকে দিয়ে দিলে।

অনুপমের আনন্দ দেখে কে! তার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রলে—তোমার নাম কি মা?

মেয়েটী বেশ ঠাণ্ডা। ভয়ে ভয়ে আদুরে ভাষায় বল্লে,—সাবিত্রী।

—বাঃ, বেশ নামটী তো তোমার······কে তোমায় বেশী ভালোবাসে মা সাবিত্রী? বাবা, না মা?

অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সাবিত্রী বল্লে, মা!

অনুপমের মুখে হাসি।—মা? তা' তোমায় কি বলে?······গল্প বলে?

সাবিত্রীর এবার মুখ খুলে গেল। বল্লে, হাঁ, কত গল্প বলে—এক রাজপুত্তুর ছিল। তার ভাব হয়েছিল এক রাজকন্যার সঙ্গে। দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করবে বলে। রাজকন্যার বাবা রাজি হ'ল না···রাজপুত্তুর কোন্ বিদেশে গিয়ে মারা গেল। আর রাজকন্যা···

অনুপম সাবিত্রীর মাথায় হাত বুলতে বুলতে বল্লে—না মা, না, রাজপুত্তুর মারা যায় নি, আজ যাবে! তার চোখে জল।

সাবিত্রী বল্লে,—তুমি বড় দুষ্টু!

দুষ্টু! আমি দুষ্টু। হ্যাঁ মা, আমি তাই। অনুপমের গাল বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

বুড়ী মা মেয়েটিকে কোলে ক'রে রাসবিহারী এভিনিউর পথে এসে অণিমাদের বাড়ী ঢুকলো। মস্ত বড় বাড়ী। চাকর, দরোয়ান, গ্যারেজ—সমস্তই আছে।

ওপরে যেতেই মাকে দেখে বুড়ীমার কোল থেকে সাবিত্রী ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মিহি গলায় চীৎকার ক'রে মাকে বল্লে, মা মা, শুন্‌চো! এই বুড়ী মা আমায় একটা বুড়ো লোকের কাছে নিয়ে গেছলো……সে খালি তোমার কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলো।

অণিমা শুনে অবাক হয়ে বুড়ীমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। কিন্তু বুড়ী মা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ অণিমা দেখতে পেলে তার আঁচলে বাঁধা একটা আংটি। তাতে তার নাম লেখা। হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে উঠলো। এর সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে তার বহুদিনকার স্মৃতি। অণিমা তবুও নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞেস্ করলে,—এ আংটিটা কোথায় পেলে বুড়ী মা? বুড়ী মা এটিকে গোপন করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। অণিমার তখন সর্ব শরীর কাঁপ্‌ছে!

সে ক্ষিপ্তার মতো টপ ক'রে ছুটে এসে বুড়ীমার আঁচলটা টেনে আংটিটা খুলে নিয়ে বাণ-বিদ্ধ হরিণীর মতো আকুল হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠলো,—বল, বল, বুড়ীমা, এ আংটি কার?……সে এখনো বেঁচে আছে?……বেঁচে আছে? তাকে তুমি কোথায় পেলে?

আমায় নিয়ে চল……আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব। অণিমা যেন অস্থির এবং মরিয়া হয়ে উঠলো।

বুড়ীমা শান্ত-কণ্ঠে বল্লে, বেঁচে আছে, কিন্তু এখন তোমায় যেতে বারণ করেছে মা; তোমায় সে আশীর্বাদ ক'রেছে……তোমার স্বামী-মেয়ে সকলকে সে আশীর্বাদ করেছে—তোমায় বলেছে, তুমি পূর্বের কথা সমস্ত ভুলে যেয়ো।—সংসার-ধর্মে সতী-লক্ষ্মী হয়ো।

কথাগুলো না শুনেই অণিমা তীরের মতো বেগে নিচে নেমে এল। তারপরই………

বুড়ীমার ঘরের সাম্‌নে মোটরটা এসে দাঁড়াবামাত্র তারা দু'জনে শুন্‌তে পেলে, অনুপম ভীষণ চীৎকার ক'রে বল্‌ছে,—বুড়ীমা, বুড়ীমা, তাদের আশীর্বাদ কচ্ছি, তুমি ব'লো, আমি চল্‌লাম……ওই জাহাজ ……ওই জাহাজ……আমায় দ্বীপান্তর থেকে খালাস কর্‌তে এসেছে……কাণ্ডারী……ক্যাপ্টেন…মাই ফাদার……দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি যাব।—তারপরই নিস্তব্ধ!

অণিমা ঘরে এসে দাঁড়াবার আগেই অনুপম তক্তপোষ থেকে লাফিয়ে মেজেয় পড়ে গেছে আর তার মুখ থেকে বেরুচ্চে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত। কী শোচনীয় দৃশ্য!

অণিমা মূর্ছিতা হ'য়ে অনুপমের বুকের ওপর এলিয়ে পড়্‌লো।

আর বুড়ীমা…………

জাগরণ

দ্বারভাঙ্গার প্রবল ভূমিকম্পের আবর্তনে অনিশদের অত বড় বাড়ীটাও অন্যান্য বাড়ীগুলোর মতো নিমেষে ভূমিস্মাৎ হ'য়ে গেল। তার সঙ্গে তার মা ও বাবা অকালে ধরিত্রীর সঙ্গে মিশে গেলেন। বেঁচে রইলো অনিশই সুধু পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য। পৃথিবী সে অন্ধকার দেখ্‌লে। ত্রিভুবনে কেউ যে তাদের আপনার লোক থাক্‌তে পারে চট্ ক'রে তা সে ভেবে পেলে না। তারপর স্মৃতির আবরণ ঠেলে বহুক্ষণ পরে সে আবিষ্কার কর্‌লে,—আছে বটে তার একজন, খুব দূর-সম্পর্কের মাসীমা। মেসোমশাই লোকটী ভালো; তাই তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য অতি কষ্টে একটা সংবাদ পাঠালে। মেসোমশাই নিয়েও এলেন, কিন্তু মাসীমার মতো বন্ধ্যা-স্ত্রীলোক অনিশের এই আগমনে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পার্‌লেন না। ছিলেন তাঁরা দু'জন, কৃপণতার ওপর দিয়ে সংসারটা বেশ কাটাচ্ছিলেন···তার মাঝখানে এই দুর্দিনের বাজারে দেখ দেখি কোথা থেকে একটা আপদ এসে জুট্‌ল ভাতে ভাগ বসাবার জন্য! মাসীমা তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠ্‌লেন।

অনিশ বাড়ীতে ঢোকা-মাত্রই মাসীমা চোখ দুটো বড় বড় ক'রে চেয়ে ব'লে উঠ্‌লেন,—ও মা গো! এ আবার কে গো!

অনিচ্ছার সঙ্গে একটা পিঁড়ি পেতে দিলেন,—নাও বসো!

অনিশ বস্‌লো।···সারা রাত্রি ট্রেণে আসবার ক্লান্তিতে সে হাঁপাচ্ছিল।

মাসীমা বল্‌লেন,—অত ভেবে আর কী হবে! তেল-টেল মেখে নেয়ে নাও, যা হবার সে তো হ'য়েছে-ই।···

মেশোমশাই বললেন,—উপস্থিত ওকে কিছু খেতে-টেতে দাও।

আচ্ছা হোচ্ছে—শুচিবায়ুগ্রস্ত মাসীমা নাক নাড়া দিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন,—খেতেই তো ও এসেছে,···মন্দ কথা কিছু বলা হ'য়েছে?··· এটা হিন্দুর বাড়ী—বুঝ্‌লে, রাজ্যের ডোম-ডোকলা ছুঁয়ে যে বাড়ীতে এলো, তাকে না নাইয়ে খেতে দিই কী ক'রে? তুমি এসে সোহাগ বাড়াতে এলে কেন বল দেখি মিছি মিছি?

মেসোমশাই আর কথা কইলেন না। পত্নীর স্বভাব বোঝেন। তার সামনে থেকে 'য পলায়তি স জীবতি' এই নীতির অনুসরণ ক'রে ওপরে চলে গেলেন।

মাসীমা গজ্‌ গজ্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে রান্না-ঘরে ঢুকে গেলেন। তারপর এক হাতে একটু গুড়, আর, আর-এক হাতে বাটি করে এক ফোঁটা নারিকেল তেল এনে বল্লেন,—নাও, হাঁ করো, ছুঁয়ো না···গুড়টুকু খেয়ে ফ্যালো, আমরা গরীব লোক বাছা, বুঝ্‌লে?

বলে গুড়টুকু খাইয়ে দিয়ে তেলের বাটি রেখে নাক ঘুরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অনিশ স্তম্ভিত! তার বরাতে শেষে এত দুঃখও ছিল! চোখ ফেটে তার জল এল। নেহাৎ সে ছোটটী নয়। ম্যাট্রিক পাশ ক'রেছে···বোঝবার তার যথেষ্ট শক্তি আছে। শেষে কিনা এই মাসীমার কাছে···তার বাপ্‌ মার মূর্তি মনে পড়্‌লো। কত তারা ভালোবাস্‌তো! হায় ঈশ্বর···তার ইচ্ছা হ'ল—এখনি সে পালিয়ে যায়, হাঁ এখন-ই। কিন্তু কোথায় সে যাবে? একান্ত নিরুপায়···নিরুপায়···

দিন কতক কেটে গেল। মেসোমশাই ধরে' করে' ফ্রি ক'রে দিয়ে রিপন কলেজে তাকে ভর্তি করে' দিলেন। কিন্তু মাসীমার এটা অসহ্য! এই বাজারে বাবুকে কলেজে পড়িয়ে লাভ কী? তিনি স্বামীর কানের কাছে মন্ত্র ঝাড়্তে সুরু করেন,—দেখ, গরীবের কথা বাসি না হ'লে মিষ্টি হয় না। আমি ব'লে দিচ্ছি, ও তোমার একদিন সর্বনাশ করবে। ...ওকে কলেজে ভর্তি ক'রে দিতে কে তোমায় বল্লে বল দেখি? এই বাজারে মিছি মিছি একটা ছেলেকে জলপানি জুগিয়ে বই কিনে দিয়ে তোমার কী লাভ হবে তা শুনি? ও যেমন ভাত মার্ছে তেমনি ওকে খাটিয়ে নাও। তুমি যদি না পার ত আমি দেখে নোব—যাক্ ও—চাকরী করুক্, দিক্ রোজ্গার ক'রে।

মেসোমশাই হাসেন। বলেন, তুমি মেয়েছেলে···কিছু বোঝ না। দু'টি যদি ভাত-ই যায় তো আমাদের কী এমন কমে যায়? আর, তা ছাড়া এ-সময় ওকে চাকরী-ই বা কে দেবে এই বাজারে? লেখাপড়া তো শেখানো চাকরীর জন্তে-ই। যদি বি-এটা পাশ করে তখন তোমার-ই ভালো হবে! ও টাকা উপায় করলে কি আর অন্য লোককে দিতে যাবে?

মাসী রাগে ছিট্কে পড়েন। দেখ, তোমার ও সব হাসি ঠাসি আমার ভালো লাগে না বলে দিচ্ছি। কাচা দিতে শিখ্লেই বুদ্ধি বাড়ে না, এটা জেনে রেখো। মেয়েছেলের যা বুদ্ধি আছে তোমার মতো দশটারও তা নেই। ও উপায় ক'রে আমায় দেবে? ইস্! প্রাণ জল ক'রে দিলে! না, তুমি আমার সঙ্গে আর কথা ক'য়ো না। ব'লেই মাসীমা কান্না সুরু ক'রে দেন।···

এ রকম ক'রে কেটে গেল অনেক দিন।···মাসী চাকরটাকে দিলেন তাড়িয়ে। অনিশের ওপর পড়্লো নেক-নজর, শাসনের ভার। তাঁর ইচ্ছা মতো দিনে পঞ্চাশ বার অনিশকে যেতে হয়

বাজারে, দোকানে। আর অনিশেরও বলবার থাকে না। কারণ মাসীমাকে সে ভয় করে,—করতেই হয়।

নীচেকার তলায় এক ভাড়াটে ছিল। কয়েকদিন হ'ল উঠে গেছে। মাসী সে দিন দশটার সময় বল্লেন, এখন কলেজ যাওয়া চল্‌বে না, তোমার জন্য-ই ভাড়াটে উঠে গেছে, বুঝছো তো বাছা এমনি তুমি পয়া! যাক্, এখন কতগুলো 'ঘরভাড়া' লিখে রাস্তায় রাস্তায় মেরে দিয়ে এসো দেখি;…আমার চারদিনের মধ্যে-ই ভাড়াটে চাই।

কথাটার উত্তর দেওয়া অনেক কিছু চলে। কিন্তু অনিশের মতো ভীরু আর নিরীহ প্রকৃতির ছেলের পক্ষে এ আদেশ নীরবে হজম ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবুও অনিশ বল্লে— সন্ধ্যাবেলায় দিয়ে এলে হবে না?

—ফের মুখের ওপর কথা, পাজী বদমাইস? মাসী যেন পুরুষদের মতো ফেটে উঠ্‌লেন—তোমার কোনো কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি যাবে কি না?

অনিশকে বাধ্য হয়ে-ই সেই মুহূর্তে পঞ্চাশখানা কাগজে 'ঘর ভাড়া' লিখ্‌তে হ'ল। তারপর আর…কোনো কথা নয়।…কলেজে সে দিন সে অনুপস্থিত।

তারপর তার ভাগ্যক্রমেই হ'ক আর যাতে-ই হ'ক ভাড়া শীঘ্র-ই এসে গেল। হ্যাঁ, ভাড়া এল। বেশী লোক নয়। পুরুষের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর বাকী দু'জন স্ত্রীলোক। মানে, ভদ্রলোকের একজন স্ত্রী আর দ্বিতীয়টী তাঁর মেয়ে।…তরুণী, দেখতে সুন্দরী-ই।

মাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন। কিন্তু অনিশের ওপর জোর -জবরদস্তি যেন তাঁর বেড়ে-ই চল্‌লো। যখন তার কলেজ যাবার

সময় উপস্থিত হয় সেই সময়ে মাসীমার যতো ফরমাজ।—ওহে নবাব পুত্তুর! বাজার থেকে আজ তেঁতুল আনতে ভুলেছ কেন? হ্যাঁ বুঝেছি, পয়সা চুরি হ'চ্ছে,! আচ্ছা দেখ্‌ছি, এখন যাও দেখি দু' আনার ট্যাংরা মাছ কিনে আনো তো।

অনিশ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে, আমার দশটায় যে আজ কলেজ আছে। অমনি মাসীমা জ্ব'লে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠেন। —রেখে দে তোর কলেজ মুখ পোড়া, সব কাজ ফেলে শীগ্‌গির এনে দে আগে। উঃ! কলেজ! কলেজ! মাসীমা ভ্যাংচানি আরম্ভ করেন।—ঝাঁটা মেরে কলেজ ভেঙ্গে দোব। তারপর-ই সুরু হয় গাল।

অনীতা মানে ওই তরুণীটী ছুটে আসে। ও চঞ্চল। অকারণে চেঁচামেচি হ'লে দেখ্‌বার ইচ্ছা অনেকেরই জাগে। এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর মাসী ওর কাছে-ই ভালোমানুষ সেজে লাগাতে আরম্ভ করেন।—দেখ্‌ছো অনী, পাপ দেখ্‌ছো···পথের এক জঞ্জাল এসে কেমন ক'রে লাথি মারতে সুরু ক'রেছে···দেখ দেখি নবাবগিরি ···বলে বাজার করতে দিয়েছি আর মা গো সেই পয়সায় বিড়ি কিনে কিনে খাচ্ছে···কোথাকার কোন্ আঁটকুড়ির বেটা গো! ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়—মাসী কাঁদতে কাঁদতে অনিশের সম্বন্ধে আরো মিথ্যা ক'রে যা তা বলতে আরম্ভ করেন। আর এমন ভাবে বলেন যে শুনলে যেন সত্যি-ই মনে হয়। আর অনিশ সেই মুহূর্তে খাতা হাতে করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রথম প্রথম অনীতা ভাবতো হয় তো বা মাসীর কথা-ই সত্যি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিজের ভুল একদিন বুঝ্‌তে পারলে। হ্যাঁ, সে বুঝলে।

অনিশ তখন ভাত খাচ্ছিল। মানে, কালকের রাত্রির পান্তা ভাত গুলো তার জন্যে-ই গরম ক'রে দেওয়া হয়েছে—তাই খচ্ছিল। আর মাসী আস্ফালন ক'র্‌তে ক'র্‌তে পরিবেশন কচ্ছিলেন। অনীতা গিয়ে দাঁড়ালো। মাসীর বাড়ী ওর অবাধ গতি। যেটুকু লজ্জা মেয়েদের জবুথবু ক'রে রাখে সেটুকু লজ্জার আবরণ থেকে ও' সহজেই মুক্ত।

অনিশ হঠাৎ বমি ক'রে ফেল্লে।

আর মাসীর সে কী কাঁপুনি।—দেখ, দেখ ছোঁড়াটার রকম দেখ,···কেমন ন্যাকরা আরম্ভ করেছে দেখ, যেই তোমায় দেখ্‌লে অনী···বুঝতে পার্‌ছো তো··· · তারপর গম্ভীর হ'য়ে, ও বমি ফেলবে কে কর্তা? জিব দিয়ে চেটে নাও···হুঁ হুঁ, এ-বাজারে ভাতের নষ্ট কর্‌তে আমি দোব না—

অনিশ তখনো বমি করছিল আর খাবেই বা কী ক'রে? একে ভাতগুলোর একটা পচা গন্ধ ছাড্‌ছিলো তারপর তরকারীর দুর্ভিক্ষ!

বল্লে, আমি খেতে পাচ্চি না।

—খেতে পার্‌ছিস্‌ না কী?—মাসী গর্জে উঠ্‌লেন, তোর ঘাড় খাবে, গে'ল্‌ রাক্ষস।

অনীতা আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না। তার চোখ সজল হয়ে উঠ্‌লো। মাসীর স্বরূপ সে আজ নূতন ক'রে চিনে নীরবে নিজের ঘরে চলে এল।

এর পর প্রায় মাস চারেক কেটে গেল।

অনিশ এক দিন ছাতের ঘরে বসে'-বসে' পড়্‌ছিলো। পড়া তার এক রকম হয়-ই না। কখনই বা পড়্‌বে? বাড়ীতে থাক্‌লেই তো ফরমাজ। তবু, এর মধ্যে যতোটুকু সময় পাওয়া যায়···

অনীতা হঠাৎ কাপড় শুকুতে দেবার অছিলায় এসে অনিশের ঘরে ঢুকে পড়লো। তারপর একেবারেই বেশ নির্ভীক কণ্ঠে বল্‌লে, শোনো অনিশদা, আমার একটা কথার উত্তর দিতে পারো ?

অনিশ প্রথমতঃ দমে' গেল। তারপর উদাস কণ্ঠে বল্লে, বলো।

—আচ্ছা, তুমি তো পুরুষ মানুষ, না স্ত্রীলোক ? তোমার মতো বোকা লোক তো আমি দুনিয়ায় দেখি নি! লেখা পড়া কচ্ছো কেন ? কেন লেখা পড়া কচ্চো ? তোমার মতো লোকের লেখা পড়া করে জগতের কী উপকার হবে, বল্‌তে পারো ? কেন, এর চেয়ে তো রাস্তায় ভিক্ষা করা ভালো, কলে কাজ করাও ভালো, রিক্সা টানাও ভালো। জগতে কারো ওপর যদি আমার রাগ হয় তো এক তোমার ওপরই হয়, তা জানো ?

অনীতা দেহে এক সতেজ ভঙ্গী আন্‌লে।—ফেলে দাও তোমার ওই বই আর লজিক-সিভিক্সের নোট—কী হবে—কী হবে ?

অনিশ রীতিমতো সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে, আমায় এ রকম তিরস্কার করার তোমার মানে কি ?

—মানে কি মানে ?—তুমি যদি আমার আপনার লোক হতে অনিশদা, তা'হলে তোমার মতো ভীরুকে নিশ্চয়ই আমি প্রশ্রয় দিতাম না, জেনে রেখো। তুমি বুঝ্‌তে পারছো না, তুমি নিজেকে কতখানি হত্যার পথে নিয়ে চলেছ! ভারী তো একটা মাসীমা, তার খেয়ালের ওপর, তার নির্দয় ব্যবহারের ওপর তুমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছ! কেন! কিসের জন্যে ?

অনীতার চোখ দিয়ে আগুন ফুটে উঠ্‌লো। আরো কী বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু অনিশ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লে। বল্লে, তুমি থামো, থামো অনীতা, আমার সে শক্তি নেই। তুমি আমার কাছে এ সব বোলো না। ভগবান—ভগবান, যা লিখেছে আমার কপালে

তা আমাকে মান্‌তেই হবে। অতখানি দুঃসাহসিকতা আমি পাব কোথা ?

…কান্নায় অনিশের চোখ লাল হয়ে উঠ্‌লো।

হঠাৎ অনীতা যেন অন্য প্রকৃতির মেয়ে হয়ে উঠ্‌লো। যা এতক্ষণ সে বলেছে, সব ভুলে গিয়ে আঁচল দিয়ে অনিশের চোখ মোছাতে মোছাতে বল্লে,—আমায় মাপ করো অনিশদা, মাপ করো, আমি বড় কড়া কথা বলেছি, আর বল্‌বো না…লক্ষ্মীটী, ছি-ছি তুমি কেঁদো না।

ঠিক এই মুহূর্তে পা টিপে-টিপে মাসীমা এসে হাজির। তিনি একবার অনিশকে বাজারে পাঠাবার জন্য এসে ছিলেন কিন্তু এই দৃশ্য দেখেই একেবারে নীচে গিয়ে বুক চাপ্‌ড়ে কান্না।…যেন কেউ মারা গেছে।

অনীতার মা কাজ করতে করতে ছুটে এলেন। অনীতাও ছুটে এল।

মাসীমা ঢেউ তুলে তুলে বল্‌তে লাগলেন,—ওগো মা গো, কী হবে গো! এই রাক্ষসী মেয়ে শেষে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেল্লে গো, এ যে আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি গো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনীতার মা উৎকণ্ঠিত চিত্তে বললেন, কী হয়েছে…কী হয়েছে… বল না দিদি।

আর হয়েছে! মাসীমা মিথ্যা করে যে গল্পটী সাজিয়ে বল্লেন তার মর্মার্থ হচ্চে…একটা বিশ্রী ইঙ্গিত।

অনীতা রাগে তিড়্‌বিড়িয়ে উঠল।—কখনো না, মাসীমা বদ্‌মাইস, …মিথ্যা কথা বল্‌ছে।

অনীতার মা-ও স্বীকার করলেন না। তিনি সম্ভ্রান্ত এবং

শান্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক এবং সমস্ত জিনিষকে উদার ভাবে বিচার করবার তাঁর যথেষ্ট শক্তি আছে। বল্লেন,—আমার মেয়েকে আমি জানি…ওকথা বিশ্বাস-ই করবো না।

শেষকালে মাসীমা অনীতাদের উঠে যাবার আদেশ দিয়ে অনিশের ওপর গিয়ে প'ড়লেন।

বিকালে মেসোমশাই আসা মাত্রই মাসীমা একথা বললেন। কিন্তু আশ্চর্য…তিনি গা-ই করলেন না। মোট কথা, তিনি মাসীমার জন্য, লটারীর টাকা পেয়ে অনেক দ্রব্যসামগ্রী কিনে এনেছিলেন, এবং বলা বাহুল্য মাসীর মনটা তাতে হাল্কা হয়ে গিয়ে আর ও-বিষয় নিয়ে বেশী আন্দোলনও করলে না। ফলে, মেশোমশাই অর্ডার দিলেন, অনিশকে এবার থেকে নীচের ঘরে পড়তে হবে।…ছাতে-টাতে একলা আর পড়া চলবে না।

তা,' তারপর থেকে কলতলার ধারে যে ঘরটায় কাঠ্‌কুটো ও ঘুঁটে কয়লা রাখা হ'ত সেই ঘরে অনিশের পড়বার জায়গা করা হ'ল। অনিশ পড়ে। অবশ্য যদি সময় পায়। কারণ পড়াটা তো তার মুখ্য কর্ম নয়, আসলে মাসীমার ফাই ফরমাজ খাটাই তো তার প্রথম কাজ!…মাসী লঙ্কার ফোড়ন দেন ;—অনিশ কাশে। মাসী রান্না ঘর থেকে বলেন,— কী রে, তোর কাশের ব্যামো হ'ল না কী?…অনিশ জবাব দেয় না। রাত্রিতে তার আধ ঘণ্টার বেশী পড়া হয় না। কারণ হারিকেনে তেল থাকে না। আর হারিকেনটা দেখলেও আনন্দ হয় না। কারণ সেটা এমনি নোংরা আর ঝুলপড়া। কাঁচটা তার এমনি ফাটা যে আলো জ্বাললেই খানিকটা পরে দপ্‌ দপ্‌ করে শিখাটা নিবে যায়। আর বই-ই বা ক'খানা আছে? এ বই পড়ে আই-এ পাশ দেওয়া চলে না। আর ঘরটাও সহজ মানুষের পক্ষে বাসের উপযোগী নয়। দিনে রাতে অন্ধকার…মেঝে থেকে ড্যাম্প উঠছে…ইঁদুরে তুলছে সিমেণ্ট… পায়খানা

থেকে আস্‌ছে বিশ্রী গ্যাস···ভাঙা দরজাটার ফুটো দিয়ে চলে যাচ্ছে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর। ইচ্ছা করে, মেসোমশাইকে একদিন বলে, কিন্তু সাহসে কুলায় না। প্রবৃত্তিতে বাধা লাগে। তা হলে না জানি মাসীমা হাতেই বোধ হয় মাথা কেটে ফেল্‌বেন !···যাক্, তবু সে পড়ে।

এই ভাবে চল্‌লো কটাদিন।

হঠাৎ একদিন মাসীমা মেসোমশাইকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় কালী মায়ের আরতি দেখতে চল্‌লেন।···অনিশের তখন একশো দুই প্রায় জ্বর। কেউ জানে না। সেই নোংরা ঘরটায় মাদুরের ওপর সে মড়ার মতো শুয়ে শুয়ে পিপাসায় ছট্ ফট্ ক'চ্ছে। কিন্তু জল দেবে কে? হঠাৎ উঠতে চেষ্টা করতেই মাথাটা তার ঘুরে লেগে গেল একটা ভাঙা টিনের চেয়ারে। আর কপালটা কেটে ভল্ ভল্ ক'রে রক্ত বেরুতে লাগলো।···তারপরই ঘর থেকে বেরুতে লাগলো একটা গোঁ গোঁ শব্দ।

অনীতা যাচ্ছিল কলতলায়। অন্ধকারে উঁকি মেরে কিছুই সে ঠাহর করতে না পেরে ধাঁ ক'রে একটা হারিকেন নিয়ে এল। কিন্তু দৃশ্য দেখেই অস্থির।···খানিকটা পরে অনীতার মা'ও এলেন। কিন্তু এ-দৃশ্যে কার না মন টলে?···দু'জনে পড়ে' সেবা করতে লাগলেন। অনীতা রক্ত ধুইয়ে দিলে; অনীতার মা দুধ এনে খাইয়ে দিলেন। তারপর তাকে চাঙ্গা ক'রে বল্লেন,—বাবা অনিশ, এত দুঃখেও তুমি বেঁচে আছ? তুমি চলো, পালিয়ে চলো বাবা; আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে চলো; ঈশ্বরের রাজত্বে কে কাকে খাওয়ায়? আমাদেরও দু'টী যদি জোটে, তোমারই বা জুটবে না কেন? চলো বাবা চলো, এ শত্রু-পুরীতে থেকে লাভ নেই,··· আমরা শীগ্‌গিরই এ বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি,···আমাদের সঙ্গে যাবে?

অনিশ কথা কইলে না।

অনীতা অনেক ক'রে বোঝালে—অনিশদা, তুমি পালিয়ে চলো, পালিয়ে চলো···সত্যি তো যেতেই হবে অনিশ দা···তুমি যাবে না?

অনিশ নীরবে অনীতার হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।

এর পর অবশ্য তার জ্বর সেরে উঠলো কিন্তু মাসীমার কাছ থেকে কোনোই দয়া পাওয়া গেল না। আরো জোর জুলুম বেড়ে উঠ্‌লো। অনিশ না কি ম্লেচ্ছ, সে বাজারের পয়সা মেরে বিড়ি খায় ইত্যাদি নানান্‌ গুরুতর অভিযোগ প্রত্যহই মাসীমার মুখ থেকে বেরুতে লাগলো। আরো আশ্চর্য ব্যাপার, মাসীমা অনিশের জন্য সকাল বেলা রান্না করা বন্ধ ক'রে দিলেন। তা, না খেয়েই অনিশ কলেজে যেতে পারতো কিন্তু যাবার মুখে চুপি চুপি অনীতা এসে তার গতিরোধ ক'রে দাঁড়াতো। কোনো কোনো দিন কলেজে খাবার জন্য অনীতা তাকে সাত আটখানা লুচি তৈরী ক'রে দিতো, কিংবা দিত সন্দেশ, বা দু'তিনটে কমলা লেবু। অনিশ প্রথম প্রথম নিত না, কিন্তু অনীতার মাও যখন তাকে এ অনুরোধ করলেন তখন আর সে অসম্মত হত না। তবু সে অনীতাকে বলতো,—তুমি আমাকে এ রকম ক'রে লোভ দেখাও কেন বল তো অনীতা?—যার দুবেলা ভাত জোটে না সে খাবে লুচি? আর আমার মতো অভাগ্যকে···

কথা শুনে অনীতার চোখ ছল ছল ক'রে উঠতো। তবু বলতো,—লুচিই যে তোমার বরাতে নেই তারই বা ঠিক কী? আর তুমিই আমাদের পর ভাবতে পারো কিন্তু সকলের মন তো সমান নয়। একটু থেমে আবার ব'ল্‌তো—তোমাকে আমি আর মা কতক'রে বোঝাচ্ছি, চল আমাদের সঙ্গে কিন্তু তুমি তো যাবে না···

অনিশ এ-কথায় কিছুতেই রাজী হ'তে পার্‌তো না।···

তারপর প্রায় দু'মাস কেটে গেল।

অনীতারা অনেক দিন হল এ বাড়ী ছেড়ে উঠে গেছে। যাবার সময় অনিশের হাত ধরে' এবারো বলে' গেছে,—তোমার যখন ইচ্ছা

হবে অনিশদা, আমাদের বাড়ী চলে এসো, কোনো লজ্জা ক'রো না… চলে' এসো, বুঝলে?

কিন্তু অনিশ যে কী ধাতু দিয়ে গড়া তা অনিশই জানে। এবার স্পষ্ট বলে' দিলে,—তা হয় না অনীতা…এ তোমার ছেলেমানুষী অনুরোধ…

এতে অনীতা অবশ্য ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল কিন্তু অনিশের মনের মধ্যে যে কী অশান্তির বন্যা বহেছিল তা অনিশই জানে।…

এর পর মাসীর আবার কতকগুলো উপলক্ষ্য এসে জুটলো। দাঁতে পায়ওরিয়া হয়েছে,…প্রতিদিন পেট গরম হয়, সেজন্য অনিশকে ঘণ্টা দু'এক অন্তর অন্তর বাজার থেকে পাতিলেবু কিনে আনতে হয়…সকাল বেলা 'ডেন্টিষ্টের' বাড়ী গিয়ে ব'সে থাক্‌তে হয়, তারপর মাসীর না কি চোখেও চাল্‌শে ধরেছে, সুতরাং চোখ দেখাবার জন্য নটার সময় মাঝে মাঝে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ফিরতে হয় সেই বেলা তিনটের সময়। অথচ মাসীমা যান চা ও গরম জিলিপিতে পেট্‌টা ভর্তি ক'রে আর অনিশ যায় খালি পেটে! যখন সে ফিরে আসে তখন তার মুখটা শুকিয়ে তুলসী পাতা, খিদেতে থুতুগুলো পর্যন্ত হজম হ'য়ে গেছে। ঈশ্বর বলে' যদি কেউ দেখবার থাকে তো দেখে নচেৎ আর দেখবে কে? এধারে অনিশের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা আসন্ন!… মাত্র এক সপ্তাহ আর বাকী আছে! বুঝতেই পারে সে—কেমন তৈরী হ'য়েছে!

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এসে গেল অনীতার মায়ের। অনীতা'র মা লিখেছেন মাসীমাকে—"দিদি ভাই, আস্‌ছে রবিবার আমার মেয়ের বিয়ে। তোমরা সকলে এসে বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবে আর অনিশকে অবশ্য অবশ্য আনবে।"—তারপর আর একখানা খাম অনিশের উদ্দেশ্যেই আলাদা ক'রে লেখা। কিন্তু মাসী সেটা পড়ে আগুনে ফেলে দিয়ে নিজের চিঠিখানিই সযত্নে তুলে রাখলেন।

তা, নিমন্ত্রণ খেতে মাসীর আপত্তি নেই। একটা জুটলেই হ'ল। পরের বাড়ী ভালো-মন্দ জিনিষ খেয়ে আসবেন—মন্দ কী? তিনি স্বামীকে সাজিয়ে গুজিয়ে তাঁর গোঁকে আতর মাখিয়ে চল্‌লেন। যাবার সময় অনিশকে চোখ রাঙালেন:—ওগো নবাব পুত্তুর, তোমাকে নে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তুমি তো গেলে চল্‌বে না বাছা···বাড়ী দেখ্‌তে হবে, দরজায় চাবি, তুমি দালানে বসে'-টসে' থেকো আর খাবার রইলো ঐ জানালার ধারে, দয়া হয় তো খেয়ো,···দেখো যেন চুরি-টুরি না হয়··· তা হলে আস্ত রক্ষে রাখ্‌বো না!

বলে যুগলে মিলে মাসী চলে' গেলেন।

অনিশ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অনীতার যে বিয়ে, এ খবর সে বাড়ীতে থাক্‌তে থাক্‌তে-ই পেয়েছিলো কিন্তু জান্‌তো না যে তাকে আলাদা করে একখানা চিঠি লেখা হ'য়েছে বা সে-চিঠিখানি মাসী আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন! কিন্তু সে যাক, মাসীর আজকের এই দুর্ব্যবহারে অনিশ যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠ্‌লো। একটা মানুষ এ রকম ভাবে কতোদিন-ই বা আর অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পারে? না হয় সে দুঃখী, না হয় মাসীমার আশ্রয়েই সে এসেছে কিন্তু তাই বলে' প্রত্যেকেরই ধৈর্যের সীমা আছে তো! বদনাম বা অপমানের তার বাকী আছে কিছু? বাজারের পয়সা মেরে সে বিড়ি খায়, সে চোর, সে ম্লেচ্ছ, সে চরিত্রহীন ইত্যাদি ইত্যাদি কতো অখ্যাতি-ই না পেয়েছে! তার ওপর পরাজয়-ই তার জীবনের একমাত্র প্রধান সম্বল, সে বুঝ্‌তে পারলে। পড়্‌তে যায় কিন্তু পড়্‌বে কী? বই নেই, দু'পয়সাওলা একটা খাতাও জোটে না। এতটুকু কৃপা, এতটুকু মায়া করবারও আজ তার জগতে লোক নেই। তার ওপর, এই অন্ধকারে একলা-ই বা প্রেতের মতো সে দালানে বসে' থাকে কী করে? ইলেকট্রিকের আলো নেই তো, যে সে জেলে ফেল্‌বে!·· সব হ্যারিকেন! তাও ঘরে চাবি দিয়ে

গেছেন মাসীমা! কারণ সে চোর!···আবার খাবার রেখেছেন··· দেখা যাক্, কী আছে!

অনিশ জানালার ধারে গিয়ে খাবার খুঁজলে।

কিন্তু খাবার তো হাতী-ঘোড়া! একটা ছেঁড়া ঠোঙ্গায় পড়ে' আছে মিয়ানো দুটী মুড়ী। অনিশের রাগে সর্বশরীর কেঁপে উঠলো। যা তার আজ ভীষণ রাগ হ'চ্ছে···হয় তো এমন রাগ জীবনে হয় নি।—তার রাগ হচ্ছে পৃথিবীর ওপর, সৃষ্টির ওপর, নিজের ওপর! সে রাগে মুড়ীর ঠোঙ্গাটাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। খাবার? খাবার? ইচ্ছা করছিলো—যদি মাসীকে সে এখন পেত' তা হলে' সে দুটো হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরতো।—কেন? কেন? সে এমন হীন হয়ে থাক্‌বে?

যদি সে চাকরও হত কারো বাড়ী, তবু তারা এমন উলঙ্গ উপহাস করতো না তার বরাতের ওপর। আর অনীতা? হঠাৎ অনীতার কথা মনে পড়তেই অনিশ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। জীবনে সে একজনকে দেখেছে, হাঁ দেখেছে।—সে অনীতা! অনীতা তাকে নিশ্চয় ভালো-বেসেছিলো, না না ভালোবাসে নি, অনুগ্রহ ক'রেছিলো, তার দুঃখ সে নিজে আত্মার সঙ্গে উপলব্ধি ক'রে ছিলো! কিন্তু কী আশ্চর্য তার চরিত্র! অনীতার প্রথম দিনের কথাগুলো তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো। অনীতা বল্‌ছে···তুমি তো পুরুষ মানুষ, না স্ত্রীলোক?···লেখা পড়া ক'চ্চো কেন? কেন তুমি লেখা পড়া ক'চ্চো? তোমার মতো লোকের লেখা পড়া করে' জগতের কী উপকার হবে বল্‌তে পারো? কেন, এর চেয়ে তো রাস্তায় ভিক্ষা করা ভালো, কলে কাজ করাও ভালো, রিক্সা টানাও ভালো!···তুমি যদি আমার আপনার লোক হ'তে অনিশদা'···উচ্চ বজ্রের চেয়েও কঠিন কথা! আর সেই অনীতাই শেষে তাকে অনুরোধ করেছিলো, তুমি পালিয়ে চলো, পালিয়ে চলো

অনিশদা...সত্যি, তোমায় যেতেই হবে অনিশদা···তুমি যাবে না? আর অনিশ সেই কথাই আত্মবিস্মৃত হ'য়ে উপভোগ ক'রে গেছে—বারংবার!

অনিশ অনীতাকে আজ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লো না। বাস্তবিকই সে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ল না। কারণ অনীতার কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা সেইটাই একটা সমস্যার কথা! হয় তো শেষ পর্যন্ত অনীতা তাকে করুণাই ক'রে গেছে কিন্তু সে-করুণা কেমন ক'রে সে আজ উদার ভাবে নেবে? পথের ভিখারীদেরও তো হাজার হাজার লোক করুণা করে; কিন্তু ভিখারীদের সেখানে মহত্ত্ব কোথা? অনিশের জীবনের ওপর ধিক্কার এল, ভীষণ ধিক্কার এল। ইচ্ছা হ'ল—সে মরে যায়, সে আত্মহত্যা করে কিন্তু এর পাপ যে ভীষণ! তার চেয়ে—সহজ উপায় সে আবিষ্কার করলে, সে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে যাবে বহু দূর-দূরান্তরে, যেখানে তার মৃত্যু হ'তে পারে—অবরুদ্ধ গুহায় পশুর মতো নয়,—অবারিত প্রান্তরে যোদ্ধার মতো। হ্যাঁ, সে পালিয়ে যাবে। কিসের তার মায়া?—কার ওপরই বা তার বিশ্বাস? অনীতার ওপর ছিল কিন্তু চার ঘণ্টা পরেই তো তার বিয়ে! দস্যুর মতো অন্য লোক এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াবে। তাকে বাড়ী নিয়ে যাবে; তারপর, তার যা কিছু হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, তার যা কিছু দেহের মোহনীয় সত্ত্বা, সে আদিম সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিতে চুল চিরে আদায় ক'রে নেবে। বিয়ে না হ'লে মানুষ যা থাকে, বিয়ের পরও তা সে থাকতে পারে না।

সে দেরী করলে না। যে জামা-কাপড়ে সে দাঁড়িয়েছিলো সেই বেশভূষাতেই সে চলে এল হাওড়া ষ্টেশনে। তারপর, ধাঁ করে একটা প্লাটফর্মের টিকিট কেটে সে সোজা এসে ডেরাডুন এক্সপ্রেসের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চড়ে' পড়লো। এর পর যে কী হবে তা

তার ভাববার বিষয় নয়। এর পর যে সে নেমে যেতে পারে বা পুলিসের হাজতে তার স্থান হ'তে পারে এও চিন্তা করবার তার সময় নেই। মুক্তির আনন্দ হয় তো সাপের বিষের মতো তার স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়তে চাইছিল কিন্তু তবুও তার বুক হু হু করে উঠ্লো। কামরাটা বিড়ি সিগারেট এবং নানান জাতির লোকের দ্বারা গুলজার হয়ে গেছে। সে-সব দিকে তার দৃষ্টি নেই···

গাড়ী বিরাট বাঁশী দিয়ে নড়ে ওঠ্বার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মানস-চক্ষে দেখতে পেল, অনীতা ছাঁদ্নাতলায় দাঁড়িয়ে! আর বরটি তার গলায় খুব আগ্রহের সঙ্গে মালাবদল করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। অনিল সইতে পারলে না।···

হঠাৎ সে জলভরা চোখ ছু'টোকে আচ্ছা করে' ছু'টো আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরলে, আর গালের ওপর ঝর ঝর ক'রে তার কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল।···

সাহিত্যিক

সুরপতি বিরক্তির সঙ্গে লেখ্‌বার খাতাটা দিল সরিয়ে। কলমটা দিল এক কোণে ছুঁড়ে, তারপর-ই ফট্‌ করে' দাঁড়িয়ে উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে নেহাৎ পেটের দায়ে সে বেরিয়ে পড়্‌লো রাস্তায়। আজ তাকে পয়সা উপায় করতেই হবে। যেন-তেন প্রকারে কর্‌বেই সে আজ পয়সা উপায়। এতে ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে' যদি তাকে জোচ্চুরীও কর্‌তে হয় তাও চেষ্টা করে' দেখ্‌বে সে। এতে আজ আর তার অপমান নেই। অপমান কিসের? লাখ দু'লাখ যারা উপায় কর্‌তে বেরিয়েছে তারা করে না জোচ্চুরী? উকিল মোক্তার, তারা সব সাধু? সর্বপ্রথম ঠাণ্ডা করতে হবে তাকে পেট তারপর তো সাহিত্য···তারপর তো শিল্প!···তারপর তো বিলাস! না খেয়ে খেয়ে মরে' মরে' মানুষ ক'দিন বাঁচ্‌তে পারে? আজ যদি না খেয়ে সুরপতির মতো কাউকে সাহিত্য-সাধনা কর্‌তে হত' তবে সে দাড়ি-ছুড়ি নিয়ে বাঁচতো নাকি পঁচাত্তর বছর! সুরপতির সর্বপ্রথম রাগ গিয়ে পড়্‌লো সম্পাদকের উপর। তাঁদের সে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে না।—জীবনে পার্‌বে না। দেশে এতবড় যে একটা 'জার্‌ণালিজম্‌' দিনের পর দিন গড়ে উঠ্‌ছে তা এই সকল সম্পাদক তার খ'র ঘেঁসে ক'জন যান? এরা জানেন তার কী? পাঠকদের কিসে

চিত্তবৃত্তি বাড়্বে কিসে তাদের অভাব-অভিযোগ জগতের সাম্নে তুলে ধরা যায়, কিসে তাদের সাহিত্য আরো মহীয়ান, আরো উন্নত হয়ে ওঠে, তার সংবাদ এঁরা ক'জন রাখেন? দেশ জুড়ে যে আজ লেখকদের হাহাকার উঠেছে, তারা যে আজ খেতে না পেয়ে ঘুরে মর্ছে, পিপাসার্ত কাকের মতো সারা দুপুর ছুট্ছে, হাঁ হাঁ করে ছুটছে স্কুল-মাষ্টারীতে, ফিল্ম-সটুডিয়োয়, প্রকাশকদের বাড়ী বাড়ী, তার কি কোনো ব্যবস্থা হবে না? তাদের কী ক্ষুধার্ত আত্মার এতটুকু অভিশাপ এসে লাগ্বে না ওই সব ধনীদের বুকে, যাদের টাকা চলছে আমোদে, আর বিলাসে! কারই বা সে দোষ দেবে?··· লোকে চায় গরুর খাঁটি দুধ কিন্তু তারা দেখ্তে যায় না গোয়াল-ঘরের অবস্থা। 'পৃথিবী' সম্পাদক অমিয়বাবুর কথাই ধরা যাক। তিনিও তো সাহিত্যিক এবং আসলে হয় তো গরীবই। লেখকরা যদি হয় বেঙাচি তিনি নিশ্চয় বেঙ। কারণ লেজ খসে' গিয়ে প্রমোশন হয়েছে একধাপ উঁচুতে। কিন্তু সুরপতি ভেবে পেল না, উপস্থিত সে কোথা যায়। নদীতে নেমে পড়া সহজ কিন্তু পথ করে' ভেসে যাওয়াই মুশ্কিল। হঠাৎ সে পকেটে হাত দিয়ে দেখে তার নস্যির কৌটা নেই। নিশ্চয় সে ফেলে এসেছে বাড়ীতে। হাঁ, নেশা তার একটা চাই। মোট কথা—সুরপতির ধারণা, মনুষকে একটা না একটা নেশা কর্তেই হয়। বার্ণার্ডশ' নেশা করে, নেশা করে রোঁমা রোঁলা, চীনের সম্রাট, আরো হাজার হাজার বড়লোক। আর এদিকে কলে যতো লোক কাজ করে, কাজ করে জাহাজে, খালাসী-মহলে, রাজমিস্ত্রী হয়ে, কাগজের অফিসে, তারা সকলেই তো নেশাখোর। নেশা ছাড়া এরা জীবনটাকে একটা জিনিসের উপর খাটিয়ে রাখ্তে পারে না। অনেকের ভাত না হলে'ও চলে কিন্তু নেশা তাদের চাই-ই। তবে নেশার মধ্যে তারতম্য আছে। জাতিভেদ আছে।

ব্যাঙ্কের কেরাণীও যে নেশাটি করবে সেই নেশাটি রবীন্দ্রনাথ করবেন না। আর সুরপতির কথা বল্‌তে গেলে আলাদা। চার পয়সার 'র' নস্যি কিন্‌লে ওর তিন দিন চলে' যাবে—অবশ্য যদি কেউ অকারণে সেটাকে আক্রমণ করে' ফুরিয়ে না দেয়। আর সব চেয়ে বড় সুবিধা যে দু পয়সায় 'র' অনেকখানি পাওয়া যায়। পরিমল হচ্চে বাবুদের নস্যি বা যারা নূতন নেশা করে তাদেরি, বেলঘোরেও তাই কিন্তু 'র' হচ্চে, একেবারে উগ্র, সাপের বিষের মতো ধারালো। এক টিপ নিলে আর রক্ষা নাই। আর এই নস্যি প্রতি দশ মিনিট অন্তর সুরপতির চাই-ই। কারো সঙ্গে কথা কইতে কইতে বা কোনো ভারিক্কে জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে করতে সুরপতির নস্যিটায় একটু তাড়াতাড়ি টান পড়ে। আর রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে প্রেতের মতো হাত বাড়িয়ে নস্যির কৌটাটা খোঁজে। তবে সে যে সিগারেট বা চুরুট খায় না, এও ঠিক নয় কিন্তু খাওয়াটাই তার পক্ষে সাধনা সাপেক্ষ।

সুরপতি আবার বাড়ীর দিকে ফিরলো কিন্তু বাড়ীটা যেন হয়ে' দাঁড়িয়েছে তার বিভীষিকা। যেখানে পয়সা নেই সেখানে সুখও থাকতে নেই। আর সুরপতির হয়েছে এই দিকেই ভীষণ পরাজয়। সে শুধু দেখেই গেছে দারিদ্র্যের রূক্ষ-মূর্তি, আর কিছু পারেনি করতে। পেয়েছিল সে অনেক দিন আগে একটা চাকরী কিন্তু মাস ছয়েক হল' সেটা চলে' গেছে। সাহিত্যিকদের বরাতে নাকি চাকরীও টেকে না। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে গীতার মতো সে একটি স্ত্রী পেয়েছিলো। আহা বেচারা! একটী অভিযোগ করতে পর্যন্ত সে জানে না। ছেঁড়া কাপড়…ছেঁড়া কাপড়-ই সই। তাই পরে' সে দিনের পর দিন আর রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে চলেছে। কিন্তু মাটীরও মুখে এক সময় ভাষা জন্মায়। রেল-লাইনও সয়ে' সয়ে' এক সময় আগুন হয়ে ওঠে।…

গীতারও সেই বিদ্রোহী মূর্তি আজ সে দেখেছে। সকালে তখন সে লিখ্‌ছিল! গীতা এসে বজ্রপাত করলে: আচ্ছা, এ সমস্ত ছাই-ভস্ম লিখে তোমার কী হচ্ছে শুনি? বাংলাদেশে সাহিত্য করা আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো প্রায় একই তো? একটা পয়সা তো আর পাও না···

কথাটা হয় তো ঠিক। কিন্তু এই কথাটা পাছে তাকে শুন্‌তে হয় এই ভয়ে সে যতটুকু সময় বাড়ীতে থাক্‌তো সেইটুকু সময়-ই ডুবে থাক্‌তো লেখায়। আজ আর তার উপায় নেই। নিশ্চয় সে ভীরু, সে কাপুরুষ। পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার যে না নিতে পারে তার বিয়ে করা কেন? কথাটা সে ভেবে দেখেছে আর এটাও ঠিক যে কেউ ভূত-ভবিষ্যৎ জেনে বিয়ে করে না। তবে বিয়ে করলেই যে যাকে বিয়ে কর্‌তে হবে তাকে শুধু খাওয়াতেই হবে এমন তো সম্বন্ধ নেই, তাকে উপবাসও করতে দিতে হবে। কিন্তু সুরপতির সাত বছরের ছেলে খোকা কী দোষ কর্‌লে? পাতে তার এতটুকু মাছ পড়ে না। আজ দশ বার দিন থেকে সে চাইছে চার আনা পয়সা চাঁদা—স্কুলে দিতে হবে,···কিন্তু সুরপতি দিতে পারে না। এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কী আছে? সুরপতিকে আজ উপায় করতেই হবে টাকা;—সে কথা সে ভুল্‌বে কেমন করে'? খুব গম্ভীরভাবে সুরপতি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে ছিল খোকা। বাবার কাছে পয়সা চেয়ে উঠলো: বাবা আমায় দুটো পয়সা দেবে?

সুরপতির বোধ হয় চোখ ফেটে জল আস্‌ছিল. উদ্গত অশ্রুকে কাপড়ের খুঁটে মুছে নিয়ে বল্লে, হ্যাঁ বাবা দেবো—আজ সন্ধ্যাবেলা এসে···

বলে' তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে সে নস্যির কৌটাটাকে আবিষ্কার

কর্‌লো একটা ঘরে। তারপর আর দাঁড়ানো নয়; একবারে হন হন করে' ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আবার সামনে পড়্‌লো গীতা। গীতা এবার অকারণে কথা কয়ে' উঠ্‌লো। বল্লে: কোথায় বেরুচ্চ?

—আবার পেছু ডাক্‌লে কেন? থম্‌কে দাঁড়ালো সুরপতি।

—তোমায় তো পেছু ডাকি নি, ডেকেছি সামনে—

গীতা এত দুঃখেও হাসে! আশ্চর্য!

সুরপতি বল্লে: যাচ্ছি সম্পাদকের কাছে। সেখানে পয়সা পাবার আশা আছে। বলে' সে একবার আড়চোখে গীতার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে' নিলে।

গীতা আবার হাস্‌লো। এ হাসি ঠাট্টার কি কিসের বোঝা গেল না। কিন্তু সুরপতির আজ এ হাসি ভালো লাগলো না। "আচ্ছা তুমি দেখো" বলে' সে আর না দাঁড়িয়ে একেবারে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

এর পর সম্পাদক অমিয়বাবুর কাছে যাওয়াই ঠিক। সুরপতি ভাবলে, যখন সে বলে' ফেলেছে এ কথাটা তখন আর এর মার নেই। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

সুরপতি চল্‌লো একটা কাগজের অফিসে। সেখান থেকে 'পৃথিবী' বার হয়। কাগজখানা মাসিক। সে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে চল্‌লো পার্ক সার্কাসে। তারপর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো। একটা বড় প্রেস··· দোতালা বাড়ী। হাঁ, এই 'পৃথিবী' অফিস বটে। ঢুকবে কিনা একটু ইতস্ততঃ করলে। তারপর চট্‌ করে' ঢুকে পড়লো। এ অফিসে—বলা বাহুল্য সুরপতি কখনো আসেনি। তবে সম্পাদক তাকে চিন্‌তে পারেন। কারণ গত মাসে তারি একটা বড গল্প প্রকাশিত হয়েছে এতে। আর খাতিরও বোধ হয় কর্‌তে পারেন।

সুরপতি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌লো। চতুর্দিকে প্রেস······ একটায় কাজ চল্‌ছে। হিস্ হিস্ করে এক প্রকার শব্দ হচ্চে আর

বাড়ীতে এক রকম কালি না কাগজের গন্ধ ছাড়্ছে মনে হ'ল। কম্পোজিটাররা সকলেই ব্যস্ত। বেচারাদের দেখলে বাস্তবিকই দয়া হয়। ঈশ্বর যেন অসুন্দর ক্লিষ্টের দলকেই পাঠিয়েছেন এই প্রেসে কম্পোজিটার করে'। একজনের মুখটা বসন্তের কালো দাগে যেন ঘেয়ো হয়ে গেছে। একজনের কাণে বিড়ি গোঁজা, গেঞ্জিটা ছেঁড়া আর, আর-একজনের আকৃতি—সেও ঐ দরের। মোট কথা, মানুষের মিউজিয়ামে এরা যেন শতাব্দীর পরিহাস!

সুরপতি উপরে উঠেই সাম্নে দেখতে পেলে একজন ভদ্রলোক বসে' বসে' কী লিখ্ছেন। তাঁকেই সে জিজ্ঞেস করলে—সম্পাদক মশায়ের ঘর কোন দিকে···

ভদ্রলোক মুখ তুল্লেন। বল্লেন, কে ··অমিয়বাবু? ও···উনি তো এখনো আসেন নি। তবে এই পনেরো মিনিটের মধ্যেই আস্বেন··· উনি ওইখানে বসেন···

বলে' ভদ্রলোক অমিয়বাবু মানে সম্পাদক মশায়ের জায়গাটা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন।

সুরপতি তাঁর চেয়ারের কাছে গিয়ে অন্য একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

পনেরো মিনিট তো দূরের কথা—সম্পাদক মশায় এলেন আধঘণ্টা পরে। সুরপতি যে ঠায় বসে' আছে তা তিনি লক্ষ্যই করলেন না। তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো কম্পোজিটার, দু'তিন জন কর্মচারী এবং আরো দু'একজন। অমিয়বাবু হাঁক্লেন: ওরে পানু! চা আন্···

পানু কেট্লী হাতে চা আন্তে চল্লো···

কম্পোজিটার প্রুফ দেখিয়ে আবার ফিরে গেল। এবং আরো পনেরো মিনিট পরে সুরপতি দেখ্লে জায়গাটা নিরিবিলি হয়েছে। তখন সে একটা নমস্কার করলে অমিয়বাবুকে।

অমিয়বাবু চা খেতে খেতে একটা আঙুল তুললেন। মানে, তিনি বল্‌তে চাইলেন যে এই হল আমার প্রতি-নমস্কার;—এখন খুশী হও তো হবে···

কী করে সুরপতি? শেষকালে নিজের পরিচয় নিজেকেই দিতে হল'।

—ও! আপনি সুরপতিবাবু! অমিয়বাবু উদাসীনতার সঙ্গে বল্লেন, ভালো, কী খবর বলুন। আর লেখা-টেখা এনেছেন না কি?

সুরপতি ভেতর-ভেতর বেশ গরম হয়ে উঠেছিল, এবার নিজেকে সম্বরণ কর্‌লে। বল্লে, না, আর লেখা আনি নি; তবে গতমাসের সেই গল্পটার জন্য আমি পারিশ্রমিক চাই, আশা করি···

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···অমিয়বাবুর কী হাসির ধুম! যেন ভদ্রলোক পাগল হয়ে গিয়ে হাসছেন বলে মনে হল। অন্যান্য লোক সব ফিরে তাকালো।

সুরপতি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—কী, অত হাস্‌ছেন কেন?

—আপনার কথা শুনে···আপনার কথা শুনে···

অমিয়বাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে কুঁত্‌কুঁতে চোখদুটো টিপে ধর্‌লেন। বোধ হয় হাসি থামাবার জন্য।

—এতে হাসবার কী আছে? সুরপতি গরম হয়ে গিয়ে বেশ তেজের সঙ্গে বলে উঠ্‌লো—এমন কী হাসির কথা হোয়েছে শুনি?

—না হাসির কথা নয়—আপনার স্পর্ধা দেখে।

স্পর্ধা আমার না আপনার? আপনি কোন্ অধিকারে আমাকে এ রকম অপমান করতে সাহস করেন বলুন তো? আমি আপনাদের কাছে গল্প দিয়েছি—এ তো আমার প্রফেসন···তার জন্য আমি পারিশ্রমিক চাইতে পারি না? এর মধ্যে স্পর্ধার কথা আসে কোথা থেকে?

—কিন্তু বলি, সম্পাদক মশায় বল্লেন, হাঁড়ী চড়িয়ে এমন-ধারা সাহিত্য করতে শিখ্‌লেন কবে থেকে? সাহিত্য জিনিষটা কী, সেটা আগে আপনার বোঝা দরকার নয় কী?

—কিন্তু সে জ্ঞান কী আপনার কাছ থেকে আমায় নিতে হবে অমিয়বাবু? স্থরপতি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো: যাঁরা হাজার লেখকের রক্ত চুষে নিজেদের ব্যবসায়কে পরিপুষ্ট করে তুলছেন তাঁরা শেখাবেন আমাদের সাহিত্য? কেন? আমাদের পারিশ্রমিকের দরকার কী? বুঝলাম না হয় আমরা হাঁড়ী চড়িয়ে লিখ্‌ছি কিন্তু আপনিও তো দেশের কল্যানের জন্য 'পৃথিবী' কাগজগুলো বিক্রি না করে' বিনা পয়সায় বিলিয়ে দিতে পারেন। তা তো কৈ দেন না! বেশ মোটা রকমই তো ব্যবসায়-বুদ্ধি আপনাদের মাথায় নিত্য নূতন গজাচ্ছে দেখ্‌ছি।

—তা আপনারা যে-শ্রেণীর লেখক তাতে আপনাদের গল্প কবিতা কাগজে উঠালে আর মাথায় ব্যবসায়-বুদ্ধি গজাতে পারি কৈ? একরকম বিলিয়েই তো দিতে হয়; বিক্রী আর হয় ক'খানা?

—সেজন্য দোষ আমাদের নয়—আপনার। অন্ততঃ নিজের অক্ষমতায় অনভিজ্ঞ হয়ে' এই বলেই মনকে প্রবোধ দেবেন বটে কিন্তু বুঝতে শিখ্‌লে জানতে পারবেন, আপনার কাগজ আমাদের মতোই শত সহস্র হাঁড়ী-চড়ানো লেখক চালায়। এবং যারা চালায় তারা দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এক রকম খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে' দেয়; তারা দধীচির চেয়েও আত্মোৎসর্গে বড় এবং প্রতি পলে পলে ক্ষয় করে তাদের দৃষ্টিশক্তি, তাদের বুকের রক্ত, তাদের স্বস্তির নিদ্রা। নচেৎ চালাতে আসে না বঙ্কিমের প্রেতাত্মা বা শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ।

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে স্থরপতি রাগে কাঁপতে লাগলো।

—কিন্তু দেখুন—অমিয়বাবু টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারলেন; মেরে চীৎকার করে' উঠ্লেন: এ-সমস্ত কথা এলবার্ট হলে ডাক্তার সুন্দরী দাসের সভাপতিত্বে বল্লে হাততালি পেতেন বটে কিন্তু এখানে একটা ঘুঁটের মেডেলও আপনাকে দেওয়া হবে না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এখনো যে আপনি কতো বড নাবালক তা আপনার ওই তড়্পানি দেখে-ই বুঝ্তে পারা যাচ্চে। আপনাদের মত তরুণ-সাহিত্যিকদের অনেক দেখা গেছে, বুঝলেন, কিন্তু দেখেছি কি? দেখেছি, তারা যত কলম লেখে তার হাজার কলম শুধু আস্ফালন করে। তাদের শক্তি কতটুকু আর হাঁড়ী চডিয়ে লেখার যে কতোখানি কৃতকার্যতা শেষ পর্যন্ত গড়ায় তা আর জান্তে আমাদের বাকী নেই। ধিক্ আপনাদের জীবনে; ধিক্ আপনাদের সাহিত্যে! কেন? কে আপনাদের লেখা চাইতে যায় ঘরে ঘরে? কে বলেছে, আপনাদের লিখ্তে? আপনারা লিখবেন না, লিখবেন না। আর যদিই আমরা অন্যায় করে' থাকি তো সে অন্যায়ের ইন্ধন তো আপনাদের দল-ই দিয়ে থাকে। গোরুর মাংস বইতে আসে না ভাল্লুকে বরং গোরু-ই বয়ে নিয়ে যায়।

সম্পাদক মশায় কথাগুলো বলে' দারুণ আত্মতৃপ্তিতে বুক ফুলিয়ে চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়লেন।

জ্বলে' উঠলো সুরপতি। তার মাথায় যেন আগুনের চিতা জ্বলছে! সেও পেছু-পা হবার ছেলে নয়। এগিয়ে এল হাতের আস্তিন গুটিয়ে। হঠাৎ দু' তিনজন লোক নিমেষে চেয়ার সরিয়ে উঠে এসে তাকে ধরে ফেল্লো। সম্পাদক মশায় দাঁড়িয়ে উঠলেন, বল্লেন, আর কোন কথা নয়, আপনি এই মুহূর্তে অফিস থেকে বেরিয়ে যান।

সুরপতি বল্লে, কারণ···?

—কারণ কী আবার? এখানে গুণ্ডামী করতে এলে লালবাজারে ফোন করে' দোব। এই দরোয়ান—দরোয়ান···

অমিয়বাবু বাড়ী ফাটিয়ে চীৎকার করে' উঠলেন।

সুরপতির সমস্ত শরীরটা ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপছে। বল্লে, থাক, আর বীরত্বে দরকার নেই। আমি নিজেই যাচ্চি ; আর শুনুন, আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করে' যাচ্চি, সময় পেলে আমার বাড়ী যাবেন, এখানে আমার ঠিকানা আছে···আপনার ভুল আমি সংশোধন করে' দোব।

বলেই সে ঘোড়ার মতো লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে পথে নেমে এল।

পথে যখন নেমে এল তখন বেলা দু'টো। দুপুরের গন্‌গন্ কচ্ছে' রোদ আর ট্রামের তারেতে হচ্চে সোঁ সোঁ করে' শব্দ। ঝরে' পড়ছে আগুন।···

এই জ্বলন্ত দুপুরেও সুরপতির গরম এক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু পকেট গড়ের মাঠ। মনে মনে একবার বলে' উঠলো—যতসব ছোটলোক···

কারণ তার মনে একটু ক্ষীণ আশাও এসেছিলো যখন সে অমিয় বাবুর চা খাওয়া দেখছিলো, হয় তো তাকে এক কাপ দেবে। কিন্তু লোকটা দেখেও দেখলে না। জেগে ঘুমানো লোকের ওইখানেই হচ্চে বদমাইসি। সুরপতি একবার গায়ের জ্বালায় মাথার চুলগুলো টিপে ধরলো। তারপর ছেড়ে দিলে। আজ যে রকম মেজাজ হয়েছিলো তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য ছিল না তার পক্ষে একটা ঘুসি মারা অমিয়-বাবুর মুখে। কিন্তু মারেনি—এটা তার গ্রহের অনুগ্রহ। যাক্, সে ভুলে যেতে চাইলো এই ব্যাপারটা। কারণ যেটা পেছনে ফেলে আসা হয়, সেটা যতো টাট্‌কাই হক' তাকে মন থেকে বিদায় দেওয়াই ভালো। আর মনে রাখাটাই হচ্ছে যন্ত্রণা। সুরপতি একটা গাছের ছায়ায় এসে মাথাটাকে ঠাণ্ডা করলে তারপর পকেট থেকে নস্যির

কৌটাটাকে বার করে' খুব বড় করে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকের গর্তের মধ্যে পুরে দিলে।

প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যেতে সুরপতির মাথাটা একটু হাল্কা হল। হ্যাঁ, সে বুঝতে পারলো তার দেহটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে আর গাছের পাতা কাঁপিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। এইটেই গ্রীষ্ম কালের মজা। কল্‌কাতা অবশ্য মরুভূমি নয় এবং এখানে উপত্যকাও নেই। তবে এই দারুণ দুপুরেও গাছের একটু-আধটু ছায়া আছে। আর এই ছায়ায় দাঁড়ালে তৃপ্তি হয়। তবে এখানে যদি একটা বেঞ্চি থাক্‌তো তা হলে বেশ ভালো হত। সুরপতি ভাবলো, মানুষ খেতে পেলে শুতে চায়, এটা অবশ্য সত্যি, তবে আরো সত্যি, মানুষ দাঁড়াতে পেলে বস্‌তে চায়! এদিক দিয়ে মানুষের কল্পনার একটা মনস্তত্ত্ব আছে··· আরামের অভিব্যক্তির একটা দাবী আছে। কিন্তু যখন বেঞ্চি নেই তখন তাকে বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হল'।

তবে মানুষ যেটা ভুলে যেতে চায়—সেটা টপ্‌ করে' ভুল্‌তে পারে না। হবে যন্ত্রণা, তাতে কী? সুরপতিকে আবার পয়সার চিন্তা কাতর করে' তুল্‌লো। হ্যাঁ, পয়সা চাই। যেন-তেন প্রকারে তার চাই-ই আজ পয়সা। সুরপতি পাগল হয়ে' যাবে না কি? একটা দুয়ার বন্ধ হয়ে' গেল। 'পৃথিবীতে' ঢোক্‌বার পথ ছিল সঙ্কীর্ণ কিন্তু অপমানিত হয়ে' বেরিয়ে আসবার পথ সে দেখ্‌লো—অবারিত। এখন সে যাবে কোথা? হায় ভাগ্যবিধাতা! সুরপতি কপালে একটা চড় মারলো।

হঠাৎ তার মনে একটা ক্ষীণ চিন্তা জেগে উঠ্‌লো। আচ্ছা, "সন্ধ্যা-শিশির" অফিসে গেলে হয় না? ওঃ, সে তো অনেক দূর···সেই মাণিকতলার কাছে। না, দূরত্বের জন্য নয়, মোট কথা, সুরপতি সেখানে যাবে না। তার এখনো মনে আছে সম্পাদক মাণিকবাবুর আচরণ। বাস্তবিক, সুরপতি যে-রকম সম্পাদক ঘেঁটেছে আর তাদের সম্বন্ধে

যে রকম চমকপ্রদ সব কাহিনী সংগ্রহ করেছে' তা একখানা খাতায় লিখ্‌লে বেশ নূতন দরের একখানা বই হয়ে যায় বাংলা-সাহিত্যে। তবে দুঃখের বিষয় দু' কপি করে'ও কাগজে ঝাড়লে পাবে না অনুকূল সমালোচনা। কারণ রাবণের দল রামের নিন্দা পঞ্চমুখে ছাপ্‌তে পারে কিন্তু তারা রাক্ষসের নিন্দা কখনই সমর্থন করবে না! সুরপতি মাণিক বাবুর কথা মনে ভেবে দুঃখের মধ্যেও একটু হাস্‌লো। একদিন সে গেছ্‌লো "সন্ধ্যা-শিশির" অফিসে। ...সম্পাদকের দর্শন-ভিক্ষুক হয়ে। তারপর শুন্‌লো, তিনি বসে' আছেন পর্দা ছাওয়া ঘরে। সুরপতি সেখানে ঢুকে গেল। তারপর-ই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।...মানে সম্পাদক মশায় অতি নিবিষ্ট চিত্তে একটী কুড়ি একুশ বৎসরের তরুণীর সঙ্গে কথা কইছিলেন। সুরপতিকে দেখেই খাপ্পা হয়ে উঠ্‌লেন -গুহার মধ্যস্থিত শৃগালের ন্যায়। আর হয়ে ওঠা তার পক্ষে স্বাভাবিক! যার সঙ্গে কথা কইছিলেন তিনি একে সুন্দরী...তার উপর আবার তরুণী! কাজেই মাণিকবাবু গর্জন করে' উঠলেন, কী চান এখানে আপনি?

সুরপতিও বুক ফোলালো। বল্লে, চাই আপনার দর্শন...আর একটু আলাপ করতে!

—না, এখন আমি ব্যস্ত...হবে না...

সুরপতির নড়্‌বার নাম নেই।...তারপরই বজ্রাঘাত।

তা, সে কথা সুরপতির এখনো মনে আছে। কাজেই ওখানে যাওয়া আর কোনোমতে সঙ্গত নয়। আর পয়সা পাওয়ার আশা অন্ততঃ আজকের দিনে মিথ্যে।

সুরপতি একবার অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। হঠাৎ দেখে সাঁ সাঁ করে' একটা ট্রাম চলে' যাচ্চে তার সাম্‌নে দিয়ে। আর সেই ট্রামেরই প্রথম শ্রেণীতে একটা জায়গায় বসে' আছেন মাণিকবাবু। মাণিকবাবু? আশ্চর্য! বাস্তবিক, একটা 'মিরাকেল'! সুরপতি

কিসের এক উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠ্‌লো। না, এ লোক না বেঁচে ছাড়বে না দেখ্‌ছি। ঠিক এই মুহূর্তে'ই সে তাঁর কথা ভাবছিল আর এই মুহূর্তে'ই তিনি তার সাম্‌নে দিয়ে যাচ্চেন। সুরপতি পাগলের মতো ট্রামটার পেছু পেছু ছুটতে লাগলো। কিন্তু ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলো না সুরপতি। হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। আর, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ট্রামটাও একটু দূরে গিয়ে তার দাঁড়াবার জায়গায় থাম্‌লো। আরো মজা, তা থেকে হঠাৎ ব্যাগ বগলে করে' নেমে পড়লেন মাণিক বাবু। বাতাস বইছে তা হলে' সুরপতির দিকেই। সুরপতি এগিয়ে গিয়ে মাণিকবাবুকে নমস্কার করলে; বল্লে, চিন্‌তে পাচ্চেন?

ঠাওর করে' করে' মাণিকবাবু বল্লেন, হ্যাঁ, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্চে তো···

—মনে হবে কেন? বেশ ভালো করে চিন্‌তে পাচ্চেন না? আমি হচ্চি সুরপতি···

—বাই জোভ্‌! সুরপতি মজুমদার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার নাম আমি যথেষ্ট শুনেছি বটে! মাণিকবাবু আধুনিক ফ্যাসানে এক চোখ টিপে বল্লেন, হ্যাঁ, আপনার লেখা আমার ভালো লাগে, আচ্ছা আপনি "সন্ধ্যা-শিশিরে" তো লেখা দিতে পারেন·

—হ্যাঁ পারি এবং ঠিক এই মুহূর্তে-ই, তারই জন্যে আমি আপনাকে খুঁজছিলাম। তবে একটা কথা কি, উপযুক্ত পারিশ্রমিক আপনি আমাকে দিতে পারেন?

কথাটা বলে' সুরপতি একবার মাণিকবাবুর দিকে চাইলো। কিন্তু ভেবে পেল না, যে-লোক তাকে একদিন একটা মেয়ের সামনে অপমান করেছিল সেই লোক-ই সে-কথা আজ মনে রেখেছে কি ভুলে গেছে।

মাণিকবাবু ভদ্র ভাবেই কথা কইলেন। বল্লেন, কিন্তু দেখুন স্যার, আমাদের কোম্পাণীকে আপনি জানেন না। অবশ্য পারিশ্রমিক

আপনাকে দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কোম্পানীটা হচ্চে হাড়-কৃপণ! পয়সা বিহনেই আমরা আজকাল আর ভালো লেখা পাচ্চি না। তবে আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, পূজার সময় কিছু পাবেন···

স্বরপতি একটু ম্লান হাসলো। বল্লে, পূজার তো ঢের দেরী। অতদিন বাঁচ্‌বো কিনা ঠিক কি? মানুষের তো জীবন···আজকেই আমার দরকার ছিল··· ; হ্যাঁ শুনুন, আপনার মনে আছে কি, আপনার কাছে একদিন আমি গেছ্‌লাম?

স্বরপতি একটা তীক্ষ্ণ চাওনি হান্‌লো মাণিকবাবুর দিকে।

মাণিকবাবু পূর্বকথা স্মরণ করবার উদ্দেশ্যে গলা চুল্‌কাতে লাগলেন। বল্লেন, না তো···

থাক্, চমৎকার আপনাদের স্মরণশক্তি, কিছু মনে কর্‌বেন না। এখন এধারে কোথায় চলেছেন?

মাণিকবাবু বল্লেন, এধারে একবার প্রেমিকা দেবীর বাড়ী যাব। আচ্ছা আসি। বলে' আর না দাঁড়িয়ে একেবারে হন্ হন্ করে' চল্‌তে শুরু করলেন।

স্বরপতি মনে মনে হাস্‌লো।—ভদ্র হলে কি হবে ভণ্ডতায় এরা চূড়ান্ত বটে!

কিন্তু এ আশাও নিব্‌লো। এখন উপায়? স্বরপতিও হন্ হন্ করে' হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা! চেয়ে দেখে লোকটা অন্য কেউ নয়—তার বন্ধু নলিনী। অনেক দিন আগে এর সঙ্গে মাখামাখি ছিল বটে কিন্তু আজকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। বন্ধুটার আর কিছু থাক্ বা না থাক্, পয়সা আছে; আর চরিত্রটা দেখতে গেলে··· ও বড়লোকদের নাকী একটু হয়! তা হক'—মনটা তবু ভালো।

নলিনী হেসে উঠ্‌লো—কিরে, কোথায় চলেছিস তাড়াতাড়ি? কেমন আছিস···

সুরপতি বল্লে, ভালো···যাচ্চি একটু · তুই কেমন আছিস্ বল্ ?

—আমরা আবার কেমন থাকি ? নলিনী সুরপতির দিকে চেয়ে আবার হাস্‌লো।

সুরপতি কোনো ভূমিকা না করেই হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলে' ফেল্লে—হ্যাঁরে নলিনী, আমায় পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারিস ?

—পাঁচটা টাকা ! কেন ? তোর টাকার কী দরকার ?

—টাকার আবার কী দরকার সেটা জিজ্ঞেস্ কর্‌তে হয় ? সুরপতি একটু ক্ষীণ হাস্‌লো—ছেলেপিলেকে খাওয়াবো···

—ছেলেপিলেকে খাওয়াবি ? নলিনী হাঃ হাঃ করে' হেসে উঠলো—তোর কটা ছেলে জিজ্ঞেস করি ? বলি, তুই এখনো সাহিত্য-টাহিত্য কচ্চিস নাকী ?

—হ্যাঁ, কচ্চি · ছেলে আমার একটা···

কথাটা বল্‌তে গিয়ে সুরপতির গলাটা কেমন কেঁপে উঠ্‌লো।

—তা হলে' শোন্, নলিনী বল্লে, ওসব কথা বল্লে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যায় না ; যদি বল্‌তিস্ আজ রাত্তিরে স্ফূর্তি কর্‌বো, তা হলে' এখনি বোধ হয় দিতাম কিন্তু এখন আর পাবি না··· ভাগ্ !

বলে' সোজা নলিনী সুরপতির পাশ কাটিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠ্‌লো আর নিমেষে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলে।

বোধ হয় সুরপতির এই মুহূর্তে যুদ্ধের গোলা পড়ে যদি একখানা হাত উড়ে যেত তা হলে' সে এত আশ্চর্য হত' না। কিন্তু নলিনী করলে কী ? সুরপতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তার চলন্ত মোটরটার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর-ই পথের এক গ্যাসপোষ্ট ধরে' সেখানে তার মাথাটা হেলিয়ে দিলে। হা বিধাতা ! মানুষ এত অদ্ভুত-ও হতে' পারে ! বিশেষ করে' এই নলিনী, তার বন্ধু নলিনী ! লোকটার এত

অধঃপতনও হয়েছে ! বলে কিনা স্ফূর্তি করতে চাইলে সে দিত পাঁচটা টাকা, নচেৎ ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে সে দেবে না ? হায় বরাত ! হায় পৃথিবী ! কেন সে চাইতে গেল ? কেন তার আজ এতখানি অপমৃত্যু ঘটল ? কৈ ! সে তো একদিনও এ পর্যন্ত কারো কাছে নিজের দৈন্য এমন উলঙ্গ করে' প্রকাশ করে নি ! কিন্তু আজ করলে কি ! মানুষের কাছে, বিশেষ করে' বন্ধুর কাছে—চেয়ে যদি এমন অপমান সইতে হয় তা হলে' জগতে কোথায় এতটুকু সান্ত্বনা · কোথায় এতটুকু নির্ভর ? তার বরাতের প্রতি এমন নিষ্ঠুর উপহাস নিয়ে সুরপতি আজ বাঁচবে কি করে ? পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সুরপতি কি উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করবে ? টাকা ! টাকা ! টাকা কোথায় পাবে সে ? আচ্ছা', এমন কোনো কৌশল তার জানা নেই, যার দ্বারা এই মুহূর্তে-ই সে লুটে নিতে পারে কিছু অর্থ—কিছু বাঁচবার মতো পয়সা ! কিন্তু কৈ···কোথা ?

সুরপতি পাগলের মতো টলতে টলতে গিয়ে একটা পার্কের ভেতর শুয়ে পড়লো। তারপর-ই জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো কেমন করে' সে আজ কিছু পেতে পারে। চুরি ! জোচ্চুরী ? এরি বা সুযোগ কোথা ? না, না, এসব দিনের আলোয় চল্‌বে না। সে একবার চেষ্টা করে' দেখবে রাত্তিরে তারপর যদি কিছু পায় তবে সে ঘরে ফিরবে। নচেৎ এইখানেই শেষ। কারণ দুনিয়া তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে আর সেও দুনিয়াকে প্রতারণা করতে পারে কিন্তু গীতার কাছে সে ফিরবে না খালি হাতে। অন্ততঃ গীতার কাছে তার সম্মান রক্ষা করা চাই। সে চারধারে একবার চাইলো। হঠাৎ দেখতে পেলে দু'টো গোটা বিড়ি পড়ে' আছে মাটিতে। ছেলেমানুষী তার যায় নি। সে তাই তুলে নিয়ে আপন মনেই পকেটে ফেলে দিলে। তারপর কখন যে সে কেমন করে' ঘুমিয়ে পড়লো কিছুই জানে না, হঠাৎ জেগে উঠে দেখে সন্ধ্যা।

চোখদুটো তার লাল হয়ে গেছে, সে ভালো করে' কচ্‌লে নিলে। জামায় তার ধুলা লেগেছে, সেটাও ঝাড়লো। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। দেখে, গ্যাসে আলো জ্বাল্‌তে জ্বাল্‌তে মই নিয়ে ছুটেছে করপোরেশনের লোক আর কতকগুলো কাক বেজায় হাঁক ডাক করে' যে যার যায়গা বেছে নিয়েছে গাছে গাছে। সুরপতি আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল। আর সে পারছে না যেন! ও! কখন সে খেয়েছে সেই সকাল বেলা। আর কী দিয়ে খেয়েছে তার মনেই নেই। মানুষের পেটের ক্ষুধা যে এত মর্মান্তিক হতে পারে তা সে যেন আজ এই প্রথম অনুভব কর্‌লে। ক্ষিপ্তের মতো সে জনারণ্যে বড় বড় পা ফেলে চল্‌তে লাগলো। তার একে একে মনে আস্‌তে লাগলো খোকার মুখ, গীতার হাসি, অমিয়বাবুর অভদ্রতা, মাণিকবাবুর আবির্ভাব আর সবশেষে নলিনীর ব্যবহার! সমস্ত মিলিয়ে যখন সে একটা ভাবনায় এসে দাঁড়ালো তখন যেন তার মাথায় খুন চেপে যাবার যোগাড়! ওঃ! পৃথিবী এত নিষ্ঠুর হতে' পারে!...এত বিশ্বাসঘাতক! সে কী করবে? কী করবে? আচ্ছা, বাস্তবকে ভুলে যাওয়া যায় না! সুরপতি ভাবলে, নলিনীর বাড়ী-ই যদি সে এখন যায় আর......আকণ্ঠ পান করে সেই লাল রক্তাক্ত মদ তা হলে' তো তার দুঃখ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলে যেতে পারে! দুঃখ-ই তো হচ্চে' বাস্তব। কিন্তু না, ঘৃণায় সুরপতির সর্বশরীর শিউরে উঠলো! যে অমন করে' তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে মোটরে চেপে চলে' যেতে পারে আর বলে' যেতে পারে, এখন আর পাবি না—ভাগ্‌, তার জীবনে সে ছায়া মাড়াবে না। কেন, সেও মানুষ আর সুরপতিও মানুষ। অন্ততঃ অধিকারের দিক দিয়ে সুরপতি তার চেয়ে কোনো অংশে ছোট?

না, সুরপতি আর জোরে ছুট্‌তে পারলো না। সে একটা রাস্তার কলে ঢক্ ঢক্ করে' খানিকটা জল খেয়ে নিলে তারপর ঢুকে পড়লো

একটা গলিতে। সাম্‌নেই দেখতে পেলে একটি বাবু চলেছেন রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে। সুরপতির ইচ্ছা করলো, ছুটে গিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরে আর ওর পকেটে যা পয়সা আছে লুটে নেয়। কিন্তু তার চেয়েও আরো সুবিধা—ওর পকেট কাটা। ও জান্‌তে পার্‌বে না আর সুরপতি গায়ে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে কেমন মজায় পয়সা কটি নিয়ে ভেগে পড়বে। বাঃ! বেশ চমৎকার বিদ্যা কিন্তু! বাস্তবিক—সুরপতি ভাব্‌লে, যদি সে এ-জীবনটা সাহিত্য করে' না ব্যয় করে' শিখ্‌তো পকেট কাটা, মানে যেমন করে' ছেলেরা কেরাণী হবার জন্য শেখে আই-কম বা বি-কম বা টেলিগ্রাফি বা টাইপরাইটিং, তা হলে' আর ভাবনা কি ছিল? এও তো একটা বিদ্যে! মোট কথা —ধরা না পড়্‌লেই হল'! আর এটাকে ব্যবসায়-ই যদি বলা যায় তা হলে' এর মূলধন একটা ধারালো কাঁচি বা ব্লেডের দরকার ছিল। তা হলে' ভালো হত'। সুরপতির এটা কল্পনা করতেও ভালো লাগলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুচিতে বাধ্‌লো। না, এ নয়। সুরপতি আবার মরিয়া হয়ে' ছুট্‌লো আরো একটা গলিতে। মাথার মধ্যে তার যেন দপ্‌ দপ্‌ শব্দ হচ্চে সে বুঝতে পারলো। হঠাৎ তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগলো আর সে ঢলে' পড়লো একজন পথিকের গায়ে। সেই পথিক আর সুরপতি ছাড়া গলিতে কেউ ছিল না। সুরপতি চেয়ে দেখে লোকটা পাঁড়-মাতাল। তবে কিছু বল্লে না—এই যা। আস্তে আস্তে সুরপতি খুনীর দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে চাইতে লাগলো আর বেশ ভালো-ভাবে লক্ষ্য করলে, লোকটা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। হ্যাঁ; সেই রকম-ই তার চেহারাটা দেখাচ্ছিল বটে! হাতে আছে সোণার আংটি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে দেশী শান্তিপুরী কাপড়, আর আশ্চর্য, লোকটা আবার আনন্দে গান গাইছে! মোটের ওপর রসিক বটে! আর এর কাছে যে টাকা থাকতে পারে না এ যেন সুরপতি কল্পনাই করতে পারলে না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সুরপতি একবার নিজের পকেটটা হাতড়ালো। দেখে, স্কোয়ারে পাওয়া সেই দুটো বিড়ি এখনো তার পকেটে পড়ে আছে। হাঁ, ভালো কথা; সুরপতি মাতালটার সঙ্গে ভাব করবার জন্য টপ্ করে' একটা বিড়ি বার করে' তার হাতের কাছে এগিয়ে দিলে আর নিজেও কী মনে করে' অপর একটি তার ঠোঁটের উপর রাখ্লে। বল্লে, নিন ধরুন, আর দেশলাই আছে আপনার কাছে ?

মাতালের স্ফুর্তি দেখে কে ? কখনো হাত নাড়ছে, কখনো নাচ্ছে তারপরই সুরপতির গায়ে একবার ঢলে পড়ে' বল্লে, হাঁ, দেশলাই আছে কিন্তু বিড়ি নয় বাবা, নাও সিগারেট···

বলে' ভদ্রলোক পকেট হাতড়াতে লাগ্লো। আশ্চর্য, হাত্ড়াতে হাত্ড়াতে তিনখানা পাকানো নোট কই মাছের মতো ঠিক্রে পড়লো তার পকেট থেকে। সুরপতির চোখ দু'টো হঠাৎ শিকারী বিড়ালের মতো জ্বলে' উঠলো। আর খপ্ করে' সে তার জুতা দিয়ে সেই নোট তিনখানা চেপে ধরে' বসে' পড়্লো সঙ্গে সঙ্গে। মাতালের তত খেয়াল ছিল না। সে দেশলাই আর সিগারেট দিয়ে গান গাইতে লাগ্লো। সুরপতি বল্লে, থাক্, সিগারেট আমার চাই না, পায়ে বড় লাগ্লো।

বলে' সে এমন ভাব দেখালো যাতে মনে হয় সত্যি সত্যি পায়ে বোধ হয় তার চোট লেগেছে কিংবা পা'টা মুচ্ড়ে গেছে।

মাতালটা আপন মনে এগিয়ে গেল। আর সুরপতি এধার-ওধার চেপে টপ্ করে' উঠে সেই নোট তিনখানা নিয়ে ছুট দিল। খানিক দূর' চলে এসে সে একটা গ্যাসের আলোয় সেগুলি পরীক্ষা করলে। দেখে তিনখানা নোট ভালোই আছে। এক একটা দশ টাকার করে'। তা হলে' সে পেলে আজ ত্রিশ টাকা! ওঃ ত্রিশ টাকা! আগের দিনের একটা কেরাণীর সুসভ্য মাইনে! তাও অনেক জায়গায় নাকি পাওয়া

যায় না। লেখা থাকে ত্রিশ টাকা আর পাওয়া যায় পঁচিশ। সুরপতির দুর্বলতায় বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করলেও তার আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করলো। কী মজা! যে টাকা সে হাজার খেটেও একমাসে পেত না বা অমিয়বাবুকে খোসামোদ করে'ও তার অর্ধেক জুটতো না, সেটা পেলে সে আজ এত সহজে! এত আরামে!

সুরপতি আনন্দে এবার পাগল হয়ে' যাবে নাকী? না, না, আর কিছু সে ভাববে না। আর ভাববে না। এবার সে সোজা বাড়ী যাবে—সর্বপ্রথম দোকানে কিছু খেয়ে নেবে আর বাড়ীতে নিয়ে যাবে। বাস্! আর পায় কে তাকে?

সুরপতি সারাদিনের যুদ্ধের পর একটা খাবারের দোকানে গিয়ে খুব খাবার খেয়ে নিলে তারপর এক চাঙ্গারি কিনে নিয়ে আরো পাঁচ রকম জিনিস কিনে সে চাপলো ট্রামে। যখন পয়সাই তার আছে তখন সে কৃপণতা করবে না।

তারপর ধরালো একটা সিগারেট। যদিও সে খায় না কিন্তু আজকের দিনে এ আফ্‌শোষ্ সে রাখবে না। কিন্তু···কেমন যেন মনটা তার উন্মনা হয়ে' উঠলো। আচ্ছা, পয়সাটা কি সৎপথে সে উপার্জন করলো? কিন্তু নয় কেন? ডাক্তার যদি গরীব লোকের কাছ থেকে চার টাকা ফি'র জায়গায় বত্রিশ টাকা ফি নিতে পারে, এটর্ণি যদি নানান খরচা দেখিয়ে মক্কেলকে ফতুর করতে পারে আর তাদের পয়সাটা যদি সৎপথ থেকে আস্‌তে পারে তবে সুরপতির-ই বা দোষ কী হল? বরং সুরপতি তো এদের চেয়ে ঢের উন্নতশ্রেণীর জীব। সে আসলে পাপ কাজ করে নি, পাকেটও মারে নি, শুধু জুতা দিয়ে চেপে ধরেছিলো তিনখানা নোট। এ তার ভাগ্যে ছিল বলেই ঘটেছে। সুরপতি এখন বেশ বিশ্বাস করতে পারলো টাকাটা ভাগ্যের জিনিষ। আর, না হলেই বা কী? সে নিত না তো নিত বেশ্যা, নিত

গুণ্ডা, নিত অনেকেই। বরং ভগবান ভালো করবে এই মাতালটার—কারণ তার টাকার সদ্‌ব্যয় হল। এ টাকা ভোগ করবে ক্ষুধাতুর, ভোগ করবে সে, খোকা, গীতা। এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কী আছে? ছুনিয়ার ধনীরা যে-সমস্ত বাজে কাজে লাখ লাখ টাকা ওড়ায় তার যদি চার ভাগের এক ভাগও জগতের ক্ষুধাতুরদের পেটে পড়তো তা হলে' আর ভাবনা কী ছিল? আর দেখতে গেলে তা মোটে ত্রিশটে টাকা! সুরপতির এই 'ত্রিশ' কথাটার ওপর ঘৃণা এল। তবে আনন্দ তার একটু হবেই···এই জন্মে যে, তার আশাই ছিল না, এখন পেল, এই যথেষ্ট।

সুরপতি মনে মনে একটা কৌশল ফাঁদলো। এখন সে বাড়ী গিয়ে কিছুতেই গীতার কাছে এই অর্থপ্রাপ্তির বিবরণ বল্‌বে না। গীতা পর্যন্ত তাকে ঠাট্টা করেছে। মানে, তার বিশ্বাস, সুরপতি লিখে কিছু পেতে পারে না কিন্তু সে তাকে জানতে দিক, হ্যাঁ পারে। অন্ততঃ স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাস থাক্। কারণ অন্ধকারের মধ্যে ভুল নিয়ে যদি কেউ স্বর্গ-সুখ অনুভব করতে পারে—তবে তাকে সে কিছুতেই জ্ঞানের আলোক দেখাবে না। তা হলে' সেটা তার পক্ষে অপমৃত্যু হবে, হবে ট্র্যাজেডি।

সুরপতি বাড়ীর কাছাকাছি এসে ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। তারপর-ই দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ী এসে গেল। দেখে, খোকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজা-গোড়ায় কাঁদছে আর গীতা বাড়ীর মধ্যে থেকে বকুনি দিচ্চে।

সুরপতি খোকাকে জড়িয়ে ধরলো: কী হয়েছে বাবা? কাঁদছো কেন?

বাবাকে দেখে খোকার কান্না আরও বেড়ে গেল।

সুরপতি চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, কেঁদ না, এই নাও, আট আনা

পয়সা। ইস্কুলে চার আনা চাঁদা দেবে আর চার আনা তোমার···এখন খাবার এনেছি, খাবে চলো বাবা···

খোকার আনন্দ দেখে কে? এক নিমেষে তার কান্না কোথায় উড়ে গেল। আট-আনিটা দেখতে দেখতে বাবার হাত ধরে' খোকা নাচতে লাগলো। চার আ···না···আ···মা···র?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ···

সুরপতি ভেতরে ঢুকে এল। সাম্‌নেই এসে পড়েছিল গীতা। সুরপতি খাবারের চাঙ্গারি আর বাদবাকী টাকাটা সব তার হাতে দিয়ে একটা ভাঙা চেয়ারে বসে পড়লো। বসে' কোঁচার খুঁটটা দিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো।

গীতার আনন্দ আর ধরে না। অনিমেষ দৃষ্টিতে টাকাগুলোর প্রতি তাকিয়ে হেসে সে জিজ্ঞেস্ করে' উঠলো: এ কি সম্পাদকের কাছ থেকে আনলে নাকি?

সুরপতি গম্ভীরভাবে বল্লে, হুঁ···

—বাঃ বাঃ! কী মজা! লিখে তুমি টাকা উপায় করলে!

গীতা ছোট মেয়ের মতো নেচে উঠলো: তা হলে' আমি এগুলো পাশের ব্যাড়ীর অণিমাকে ডেকে দেখিয়ে আসি···ও বড্ড আমায় খোঁটা দিত···

বলে' ছোটে আর কি···

সুরপতি খপ্ করে' গীতার একখানা হাত ধরে' ফেল্‌লো।

—কী ছেলেমানুষী কচ্চ' তুমি? যাও, এখন চা-টা করগে যাও, পয়সাটা তুলে রাখ আর আমায় স্থির হয়ে খানিকটা বসতে দাও···

গীতা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রশংসমান দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

খোকা কথা কইতে যাচ্ছিল, গীতা মুখ ঝাম্‌টা দিলে—তুই থাম খোকা। দেখছিস না, তোর বাবা একটা গল্পের প্লট ফাঁদ্‌ছেন!

তারপর খোকার কাণে কাণে গীতা বল্লে, তোর বাবা খুব মস্তবড় সাহিত্যিক রে···জানিস! ওঁকে অমন করে' বিরক্ত করিস নি। আয়, খাবি আয়···

বলে' তাকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেল।

সুরপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে উঠলো।

গীতার কাছে তার আজ এই সর্বপ্রথম·মিথ্যাকথা বলা! হায়, যদি সে আজ সত্যসত্যই সম্পাদকের কাছ থেকে টাকা আন্‌তো···

তা হ'ক, সুরপতি বেশ ভালো অভিনয় করেছে। সে অন্য ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেল্লে। তারপর-ই তার নজর গেল একটা তাকে—যেখানে তার অপ্রকাশিত উপন্যাস আর রাজ্যের মাসিক-পত্র জড় হয়ে আছে। সুরপতির হঠাৎ রাগ হল' ওইগুলোকে দেখে। লেখার বাজার চমৎকার! আর লেখকের জীবন তো এই! সুরপতি দু' বগলে দু' সারি কাগজ আর খাতা ভরে' নিয়ে ছাদে উঠলো। তারপর-ই ময়দার বস্তার মতো দুমদাম করে' সেগুলো একটা জায়গায় ফেলে দিলে। তারপর ছাদের দরজাটা বন্ধ করে' দিলে। সুরপতি জাল্‌লো একটা দেশালাই কাঠি। আজ এগুলো সব পুড়িয়ে ফেল্‌বে সে। পারবে না? সাহস সংগ্রহ করে নিলে সুরপতি। তারপর-ই ধীরে ধীরে জ্বলন্ত কাঠিটাকে হাওয়ার মুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য দু'হাত দিয়ে আড়াল করে' ধর্‌লো, যেমন করে' আড়াল করে প্রদীপ-শিখা পূজারী তার পূজার মন্দিরে। আর, এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ দিয়ে।······

কিন্তু ঠিক এক মিনিট পরেই দেখা গেল, যে-কাঠিটা সে জ্বেলেছিল ওই কাগজ-পত্রগুলোকে পোড়াবার জন্য, সেটায় সেগুলো পোড়ায় নি সে। পুড়িয়েছে মাত্র একটি সিগারেট। আর চোখের জল-টল মুছে দারুণ তৃপ্তির সঙ্গে সুরপতি সেটা টান্‌ছে--তারা-ছাওয়া দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে!

সেফটিপিন

আর উপেক্ষা করা যায় না। শুভ্রাকে ডাক্তার দেখাতেই হবে। দিন দিন ও যেন কৃশ থেকে আরও কৃশতর হয়ে উঠছে। হিরণ বেশ লক্ষ্য করে, বিয়ে হবার সময় শুভ্রার যে পরিপূর্ণ দেহ ছিল, আজ এই দু'বছর না কাটতে কাটতেই একেবারে যেন সে ম্লানিমায় জুড়িয়ে আসছে। নিশ্চয় শুভ্রার দেহে জীবনী-শক্তির অভাব হয়েছে। আর মনে হয়, একটা লতার মূল শেকড়টা কেটে দিলে তার যা অবস্থা হয়, শুভ্রার বেলায়ও যেন সেই রকম একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু কেন? হিরণ তো মোটেই তাকে অযত্ন করে না। তার অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে তো সে ঢেকে দিয়েছে শুভ্রাকে। আর শুভ্রাই বা কম যায় কৈ? কী সুনিবিড় ভক্তি আর প্রেম দিয়ে সে হিরণের স্বপ্নিল কল্পনাকে রূপায়িত করে দিয়েছে। ঠাকুর আছে, চাকর আছে কিন্তু হিরণের কাছে শুভ্রা নিজে ছাড়া আর সেখানে যেন কারো অস্তিত্ব নেই। অফিস যাবার সময় টাইটি পরানো থেকে সুরু করে' শুভ্রা স্বহস্তে হিরণের মোজা আর জুতা পর্যন্ত পরিয়ে দেয়। তারপর অফিস থেকে আসার পরও সেগুলো খুলে দেওয়ার সেই পর্ব—সেই পূর্বানুবৃত্তি। কোথায় চা, কোথায় জলখাবার, এমন কি পানে কতটুকু চূণ দিতে হয় সে-খবর শুভ্রা ছাড়া আর কেউ জানে না।

সেই শুভ্রার শরীর দিন দিন কৃশ হয়ে যাচ্ছে! সত্যি। এ কী অসুখ! হিরণ খুব তীক্ষ্ণ ভাবে চেয়ে যেন তাকে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করে। আর ক্বচিৎ কখনো হঠাৎ বুঝতে পারে—শুভ্রা যেন কী ভাবে। হ্যাঁ, ভাবে কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। আবার মেঘের ছায়া সরে যায়। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে শুভ্রা হিরণের সেবায়।

হিরণ পারে না এড়িয়ে যেতে। বলে—শুভ্রা, আমি বুঝতে পাচ্ছি তোমার যেন মনে কিছু কষ্ট আছে। আচ্ছা সত্যি, তোমার মনে কিছু ব্যথা নেই? আমার কাছে গোপন কচ্ছ?

কিন্তু ব্যথা যে কী আছে বা থাকতে পারে তার আভাষ পর্যন্ত পাওয়া যায় না শুভ্রার কাছ থেকে। শুভ্রা অবাক হয়ে হেসে উঠে বলে—দিন দিন তোমার এ পাগলামী বাড়ছে কেন? এসব কথা বুঝি বাইরের বন্ধুরা তোমায় শিখিয়ে দেয়?

—না, তা শেখাবে কেন? অপ্রতিভ হিরণ জবাব দেয় একটু আম্‌তা আম্‌তা করে'।

—তবে এই ব্যথা বা কষ্ট হঠাৎ স্পষ্ট করে' বল কী করে'? কৈ! এর আগে তো এরকম কথা তোমার কাছ থেকে শুনতাম না। অভিমান করে শুভ্রা।

—না, তা শুনবে কেন? এর আগে তো তোমার শরীরের এই অবস্থা হয় নি!

হিরণ এইভাবে বাদানুবাদ করে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন বাড়ীতে ডেকে আনে তার ডাক্তার-বন্ধু সঞ্জয় চৌধুরীকে। ইনি বিলাতে গিয়ে নাকি কয়েক বৎসর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডুবে থেকে একটা বড় দরের বিলাতী ডিগ্রী এনেছেন সঙ্গে করে।

সঞ্জয় চৌধুরী শুভ্রার রূপ দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে যান; তারপর

খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্ত শরীর যতোদূর সম্ভব নাড়া চাড়া করে দেখেন, পিঠে আর গায়ে নল বসান তারপর মুখখানা গম্ভীর করে তোলেন।

ডাক্তারের এ-রূপ হিরণের ভালো লাগে না। বেরিয়ে যাবার সময় হিরণ অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করে—কী দেখলে বল। খুব খারাপ অসুখ কিছু কী?

কিন্তু ডাক্তার যা জবাব দেন তাতে প্রথমটা হিরণের স্তব্ধ হয়ে বসে পড়বার মতো অবস্থা হয়।···

ডাক্তার তখনো বলে যেতে থাকেন—হ্যাঁ, ওঁকে নিয়ে যেতে পারো যদি কাশ্মীরে আর রাখতে পারো সেখানকার স্যানিটেরিয়ামে বা পুরীতে বা যাতে উনি আনন্দ পান সেইসব কাজ করতে পারো তাহলে হয়তো বাঁচতে পারেন।

হিরণ স্তব্ধ হয়ে শোনে···যেমন করে আসামী শোনে ফাঁসীর হুকুম। পাছে সঞ্জয় ভুল করে' দেখে যেতে পারে, এই ধারণা নিয়ে সেই দিনই মনকে প্রবোধ দিয়ে সে কল্‌কাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে বাড়ীতে কল দিয়ে দেয়। কিন্তু তারও মুখে সেই এক কথা।—টি-বি, টি-বি! যক্ষ্মা! শহরের প্রতি ধূলিতে যার স্রোত চলেছে তারি খানিকটা স্পর্শ ঘটেছে শুভ্রার দেহে। আরো ডাক্তার বলেন, ওসব কাশ্মীর-কাশ্মিরের আশা ছেড়ে দিয়ে সোজা নিয়ে যান যাদবপুরে। ভালো যদি হবার হন তো ওখানেই হয়ে যাবেন। কাশ্মীর বা পুরী নিয়ে যেতে গেলে রোগিনী হার্টফেল করবেন।

হিরণ এবার মরিয়া হয়ে ওঠে। মুখোমুখী তর্ক করে ছেলেমানুষের মতো ডাক্তারের সঙ্গে। বলে, আচ্ছা, শুধু শরীর রোগা হয়ে গেলেই বুঝতে পারেন যক্ষ্মা হয়েছে?

—আজ্ঞে না; ডাক্তার বোঝান, যে যে চিহ্নগুলো এ অসুখের প্রথম অবস্থায় ধরা পড়ে সেগুলো সবই প্রায় বর্তমান এখানে।

উনি খুব বেশী ভাবেন বলে' মনে হয়, তারপর ওঁর নাড়িতে আছে জ্বর তারপর বুকের এক্সরে নিলে দেখতে পাওয়া যায়—

ডাক্তার এইখানেই কথা শেষ না করে থামলেন।

আর শোনবারও ইচ্ছা ছিল না হিরণের।·· ফি-য়ের টাকাকটি ডাক্তারকে দিয়ে হিরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এখন উপায়! উপায়!

শুভ্রাকে কি তাহলে হারাতে হবে? আর ওর যে যক্ষ্মা হয়েছে একথা সে আগে জানে নি কেন? এজন্য দোষ তো হিরণের। কিন্তু শুভ্রার কি দোষ নেই? আগে থাকতেই তো শরীর ওর একেবারে কঙ্কাল হবার যোগাড় হয়েছে অথচ ওর ভেতরে কী কষ্ট হয় নি? সে কেন একদিনও বলে নি?

হিরণ গিয়ে শুভ্রার দু'হাত ধরে কেঁদে ফেলে। বলে, তোমার এ অভিমান কার ওপর? মরে যাওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য ছিল তাহলে আমাকে এভাবে বঞ্চনা করবার তোমার কী দরকার ছিল?

শুভ্রা ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুতর বলে ধরে নেয় না। হিরণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—আমার কিছু হয় নি। তুমি অত উতলা হয়ো না।

—এর পরও হয়নি? হিরণ জবাব দেয়।

তারপরই দিন দুয়ের মধ্যে যাদবপুর হাসপাতালেই শুভ্রাকে রেখে আসবার জন্য তোড়-জোড় করে।

তারপর একদিন এইখানেই শুভ্রাকে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হিরণ তুলে দিয়ে গেল। উপায় নেই। আর যেমন তেমন করে তুলে দিয়ে গেল না। গেল সবচেয়ে বেশী টাকার রোগীর মতো। শুভ্রা এখন রোগিনী। পাঁচজনে তার তত্ত্বাবধান করে। আর যাদের সঙ্গে কোনোকালে তার পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, সেইসব নার্সরা তাকে বোনের মতো বুক দিয়ে যত্ন করে' সান্ত্বনা দিয়ে যায়।

হিরণ রোজই আসে একবার পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু যতো দিন যায় ততো যেন খারাপ লক্ষণই প্রকাশ পায়। ইদানিং শুভ্রার মুখ দিয়ে নাকী রক্ত ওঠে। ওর বুকে ভীষণ যন্ত্রণা, আর বাকী রইলো কী? কিন্তু এজন্য মুস্কিল নয়। মুস্কিল হল—একটা সেফ্‌টিপিন নিয়ে।

হিরণ বিকেলে একদিন দেখতে এসে দেখে নার্সের সঙ্গে শুভ্রার নাকী একটা বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি চলেছে। বিষয়টা আর কিছুই নয়। নার্স বলছে বুকে একটা প্রলেপ দিতে হবে, তাই বুকের ব্লাউজের সেফ্‌টিপিনটা খুলে ফেলতে হবে। কিন্তু শুভ্রা তাতে রাজী নয়। বলে, প্রলেপে আমার দরকার নেই। এই সেফ্‌টিপিন নিয়ে টানাটানি করবেন না।

—কিন্তু সেফ্‌টিপিন-ই বা রয়েছে কেন? ওখানে বোতাম নেই? হিরণ জিজ্ঞাসা করে। : সেফ্‌টিপিন তো থাকা ভালো নয়, কখনো ফুটে যায় যদি···

কিন্তু না, হাজার অনুরোধেও সেফ্‌টিপিন সরানো গেল না। বোতাম আছে বটে কিন্তু শুভ্রা সেফ্‌টিপিন খুলবে না।

হিরণ ভাবে—হয় তো লজ্জায় পড়েছে শুভ্রা তার সামনে। তাই বলে, আমি একটু সরে যাব?

কিন্তু না, তাতেও ও রাজী নয়। শুভ্রা তাকে পাশে বসতে বলে। আর কেমন যেন মূক হয়ে আসতে থাকে ওর ভাষা। শুভ্রার চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা অশ্রু!

বাড়ীতে ফিরে এসে হিরণ কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে আজকের ব্যাপারে। তার মাথায় চিন্তার চিতা জ্বলে ওঠে। আচ্ছা—একটা ছোট সেফ্‌টিপিন —তার এমন দাম কী? এক আনায় তো একগাদা পাওয়া যায় অথচ হাজার চেষ্টায় শুভ্রা সেটা কিছুতেই সরাবে না! আচ্ছা তো! অথচ হিরণও মনে করে দেখলে এটা তার রয়েছে অনেক দিন থেকেই।

এ নিয়ে যেন কবে সেও কী একটা কথা বলেছিলো শুভ্রাকে আর তার জবাবে শুভ্রা বলেছিলো—এই বোতামগুলো ধোপার বাড়ীতে কাচতে দিয়ে ভেঙ্গে গেছে কিনা, তাই একবার—

কিন্তু সেই বোতাম কী আর কখনো লাগানো হয় নি ব্লাউজে? আর ব্লাউজ তো তার একটা নয়!

হিরণ অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে ঘরময় পায়চারী করে। তারপর হঠাৎ চাবি নিয়ে শুভ্রার একটা স্যুটকেশ খুলে ফেলে। এই স্যুটকেশের ভিতর ওর একটা ফটো আছে। হ্যাঁ, শুভ্রার ফটো। ভিতরের জিনিষপত্র-গুলো খানিক নাড়া চাড়া করে ফটোটা প্রথমে পায় না; পায় একটা খাতা, বেশ মোটাসোটা, বাঁধানো। এ খাতাটা তো কোনোদিন দেখে নি হিরণ। ওর কৌতূহল হয়, আর তারপরই সামনের কতগুলো পাতায় চোখ বুলিয়ে যায়। কিন্তু একটা পাতায় দৃষ্টি পড়তেই সহসা সে অবাক হয়ে ওঠে। হেডিং'এ লেখা আছে—সেফ্‌টিপিন—

কী আশ্চর্য! এখানেও সেফ্‌টিপিন! তবে কি এটা শুভ্রার জীবনের ডাইরী! কৈ! একদিনও তো শুভ্রা হিরণকে জানায় নি যে সে ডাইরী লেখে। কী লেখা আছে দারুণ আগ্রহভরে সে পড়তে সুরু করে। কিন্তু এ-রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব জিনিষ পড়া ঠিক সাজে না। তাই হঠাৎ হিরণ ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেয় তারপর সে একটা সিগারেট ধরায়, দু'চার টান টানে, বুকের ভিতর ধোঁয়াটা বেশ মিষ্টি করে অনুভব করে তারপর খানিকটা চোখ বুজে কী ভাবে। এগুলো মানুষের পক্ষে অনেক সময় স্বাভাবিক। কারণ এটা পড়লেই তো চিরকালের জন্ম ফুরিয়ে যাবে এর গোপনীয়তা। তাই যতদূর সম্ভব জিনিষটা রয়ে সয়ে অনুভব করাতেই আছে মাধুর্য। তাই ভয়ে ভয়ে আর ধীরে ধীরে প্রতিটী অক্ষর সে অতিক্রম করতে থাকে। কিন্তু একটা সময় এল যখন সে বিস্মৃত হল নিজেকে। রুদ্ধ

হল তার নিঃশ্বাস। আর দেখলে কবিতার মতো সে শেষ করে ফেলেছে সেই লেখাটুকু যার পর আর কোনোই তার উত্তাপ নেই। কিন্তু সেই মৃত-লেখারই উপর যদি আবার চোখ বুলানো যায়, তাহলে যে কটি লাইন এইমাত্র মনে বেজে ওঠে, সেটি ঘুরে ফিরে শুভ্রাকেই মনে পড়িয়ে দেয়।

শুভ্রা লিখেছে :—

আকাশে চাঁদ রয়েছে—কতো রাত্রি কে জানে!

চারিদিকে কামিনী, হাস্নাহানা আর গোলাপ ফুলের গন্ধ। কনক! তুমি আমায় বলেছিলে, ওই ঝোপটার কাছে যেয়ো না। সাপ আছে। কিন্তু সাপের ভয় আমি করি নি। গেছ্লাম। তারপর দেখলাম একটা গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে ফুটে আছে—কী সুন্দর একটা ইয়া বড় গোলাপ ফুল। তুলে নিতে গিয়ে হাতটা ছোড়ে গেল কাঁটায়। চিন্-চিন্ করে রক্তও বেরিয়ে এল একটুখানি। তুমি অধীর হয়ে ছুটে এলে। নিজের কোঁচার খুঁট ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে বেঁধে দিলে আমার হাতটা। তারপর তোমার জামায় গাঁথা ছিল যে সেফ্টিপিনটা, সেটাও খুলে আমার হাতের ব্যাণ্ডেজ শক্ত করে আটকে দিলে। তারপর—কতোদিন কেটে গেছে, কতো ঋতু আর কতো রাত্রি, সে বাঁশী-ধ্বনি তোমার কোথায় লয় হয়ে গেছে। সেই তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার দিন কবে শেষ হয়ে গেছে, আজ তুমি আর ইহ-জগতে নেই। কিন্তু যেখানেই থাকো প্রিয়, তোমার সে প্রেম আজও ভুলি নি। তোমার দেওয়া সেই সেফ্টিপিন (যতো সামান্যই হক), সেটাকে স্থান দিয়েছি আমার বুকে। আর যখন এটা বুক থেকে সরাবো, জানবে আমার মৃত্যু হয়েছে, আমি নিঃশেষে এ জগতের মধ্যে মারা গেছি, আমি তোমার···

কী ভয়ানক ব্যাপার! হিরণ পড়ে যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। অলক্ষিতে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা কখন হস্তচ্যুত হয় তা তার খেয়ালই

থাকে না। হিরণ ভাবতে থাকে—এই জন্যই বোধ হয় শুভ্রার মনে কখনো কখনো চিন্তা দেখা দিত। আর এই করে' করে'ই সে আজ মরণের মুখে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই কনকটি কে? হিরণ যেন নিমেষে আবিষ্কার করবার জন্য তাকে উন্মাদ হয়ে ওঠে। ভাবে, কনক আর হিরণ, তফাৎ কেবলমাত্র নামে কিন্তু অর্থে তো একই। অথচ এই শুভ্রা—পতিব্রতা শুভ্রা কোনোদিনই তো ঘূণাক্ষরে একথা তার কাছে প্রকাশ করে নি। তাহলে কী জানতে হবে, শুভ্রা এতদিন তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে! কে জানে তা? হিরণ ক্ষেপে ওঠে আর ডাইরীর পাতাগুলো অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে উল্‌টে যায়। হঠাৎ আর এক জায়গায় তার দৃষ্টি পড়ে। সেখানে কয়েক লাইন কী যেন শুভ্রা লিখে রেখেছে। হিরণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়ে।

শুভ্রা লিখেছে :—

'আমার স্বামী হচ্চেন দেবতা। আমি জানি, এ কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করলেও ক্ষমা করবার মতো তাঁর উদারতা আছে। কিন্তু কেন জানি নে, আমার ভয় করে। হয়তো এ ভয় দুর্বলতারই নামান্তর! ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন।'

কার ঈশ্বর! আর কে কাকে ক্ষমা করে? হিরণ আর কোনো-দিকে তাকায় না। নিঃশব্দে ডাইরীটা এক পাশে ফেলে দিয়ে সে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। আর বসে বসে শুধু ভাবে।……

তার পরদিনেরই ঘটনা।

হিরণ হাসপাতালে ঢুকতে যাবে কী সহসা দেখা সেই পরিচিত নার্সটীর সঙ্গে। মানে, এই নার্সটির সঙ্গেই সেই সেফ্‌টিপিন খোলা নিয়ে শুভ্রার তর্কাতর্কি সুরু হয়। কিন্তু নার্স হিরণের সামনে খুব বিমর্ষ…। দেখা হতেই নমস্কার করে বললে, কিছু মনে করবেন না স্যর, মাত্র দশ মিনিট হল উনি—তা মরবার আগে যেন

কি একটা বলতে চাইছিলেন কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। বেজায় ধস্তাধস্তি করছিলেন বিছানার ওপর আর সহসা সেই সেফ্‌টিপিনটা খুলে গিয়ে তাঁর বুকে বিঁধে গেছে।...

সে কী! সহসা যেন হিরণের মাথায় বাজ পড়লো। সোজা সে এগিয়ে গেল, নার্সের কাছে না দাঁড়িয়ে। আর যেখানে এই দশ মিনিট হল শুভ্রার আত্মা মুক্তি পেয়েছে সেখানে গিয়ে সে থম্‌কে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। হয়তো এর ব্যথা পরে বাজবে। কিন্তু সেজন্য নয়, হিরণ বেশী করে যেটা লক্ষ্য করলে—সেটা হচ্চে সেফ্‌টিপিন। সত্যই তার কাঁটাটা বিঁধে আছে শুভ্রার বুকে আর কয়েক ফোঁটা রক্ত নির্গত হয়ে সেখানকার ওপরের কাপড়টা ভিজিয়ে দিয়েছে জবাফুলের মতো।

হিরণের দুঃখ হল আর হল কেমন যেন ভয়। কিন্তু এ ভয় দুর্বলতারই নামান্তর। হিরণ কী করতে পারে? বড় জোর শুভ্রার কথাটাই কেড়ে নিয়ে বলতে পারে—ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন!

চলন্তিকা

কালিঘাট। কালিমন্দিরের সামনের নাট-মন্দিরে বসেছিলাম। বসেছিলাম ঠিক ঢোকবার পথেই।···একপাশে গুটি-সুটি মেরে। রবিবার —কাজেই আজ তাড়া নেই। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা বাজে। মন্দিরের দরজা খুলবে এইবার। তারপর চলবে লোকজনের ঠেলাঠেলি, চলবে পয়সা এবং পাণ্ডাদের ছুটাছুটি। মার হবে আরতি। কিন্তু এই ভীড়ে মারামারি করে আরতি দেখবার আমার ইচ্ছা নেই। বেড়াতে এসেছি, জায়গাটা ভালো লাগে, এই পর্যন্ত। কাজেই খানিকটা পরে উঠবো কি না ভাবছি, এমন সময় দেখি জনতিনেক মহিলা নিয়ে এক স্থূলাঙ্গ ভদ্রলোক এসে পাশের জায়গাটুকু দখল করলেন।

মহিলাদের মধ্যে দু'জন বয়স্বা—বোধ হয় একজন হবে ভদ্রলোকের পত্নী আর দ্বিতীয়টী তার ভগ্নী-টগ্নি হবে। আর শেষোক্তটী তার মেয়ে নিশ্চয়। রূপসী নয়—কালো। বিয়ে থা হয় নি। বয়স—তা প্রায় আঠারো-উনিশ হবে বৈকি!

ভদ্রলোক বল্লেন, সব স্থির হয়ে বোস'। আর মনে মনে চিন্তা করো—

কী চিন্তা করবে মনে মনে আমিও চিন্তা করে দেখলাম। হ্যাঁ, জায়গা হিসাবে এখানে যেটুকু চিন্তা করা যায় সে হচ্ছে আধ্যাত্মিক।

কাজেই এতগুলি প্রাণী এই মুহূর্তে যে এত আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবে তা মনে মনে স্বীকার করলাম না। তবুও দেখি, সকলে চিন্তা করতে বসেছে। হয় তো যাদৃশী ভাবনা যস্য—হাসি পেল। কী চিন্তা করবে? সংসারের জ্বালায় জ্বলে'-পুড়ে মানুষের চিন্তার কী কিছু শেষ আছে? ওই যে কালো মেয়েটি হেঁটে আসার ক্লান্তিতে বসে বসে হাঁপাচ্ছে—ও কি চিন্তা করছে? ভদ্রলোকের পত্নী-ই বা এমন কি চিন্তা করছে, বুঝলাম না। তবুও চিন্তায় যে ও অভ্যস্ত তা ওর কপাল দেখলেই বোঝা যায়। কপালে রেখা—

তবে চিন্তা যদি করে কেউ করুক—আমি উঠলাম। কারণ এই চিন্তার পাশে বসে কি জানি যদি ফের আমাকেও চিন্তা পেয়ে বসে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।

দাঁড়ালাম।

দেখি জুতাজোড়াটা ছেড়ে এক ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। একান্ত দেঁতো হাসি। একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন, আপনি এখানে আছেন তো?

—কেন বলুন তো?

—না, মানে জুতা বড় চুরী হচ্ছে কিনা, তাই বলছিলাম আপনি থাকলে—

—আমি থাকলে আপনার জুতা চুরী হবে না? এই তো? কিন্তু এখানে কি আপনার জুতা দেখবার জন্যে আমি আছি? ভীষণ রাগে লোকটার জুতার দিকে চেয়ে বল্লাম—পরেন তো সস্তার বাটা—তা যদি চুরী যাবারই ভয় থাকে তো পকেটে পুরে ভিতরে যান। বলে কেটে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

এখন যাই কোথা? ধীরে ধীরে চারিদিকে তাকালাম। হঠাৎ দেখা—মদনের সঙ্গে। মদন হচ্ছে আমার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্‌নে।

বয়স ষোল-সতেরো হবে। লেখাপড়া বেশী করে নি। কাজ করে খিদিরপুর ডকে। দৈনিক মাইনে—তা প্রায় মাসে ষাট-সত্তর টাকা হয় বোধ হয়।

বল্লাম, কী রে? কেমন অছিস? বাড়ীর সব ভালো?

—না, ভালো নয়, মদন বল্লে, আমার বোনের বড় অসুখ। ছোট বোন—

অনেকদিন মদনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। কাজেই জানতাম না কোথায় ওরা থাকে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় আছিস এখন?

মদন বল্লে, খিদিরপুরেই। চলুন না আমাদের বাড়ী, মা আপনাকে কতোদিন দেখে নি—দেখলে তার খুব আনন্দ হবে। যাবেন?

ভাবলাম, মন্দ কি? যাওয়া তো উচিত। স্বীকার করলাম—যাবো। তবে তুই এদিকে কোথায় এসেছিলি?

মদন বল্লে, আরতি দেখতে। তা থাক্, আর একদিন দেখবো এখন। চলুন—

মদন আমার আগে আগে চললো।

পথে ধরালাম একটা চুরুট। বল্লাম, যেন বলিস নি তোর মাকে বা কাউকে যে আমি চুরুট খাই। শুনলে অবাক হবে।

মদন মুখ টিপে হাসলে। বোধ হয় হাসির মানে তার এই যে আমি ছেলেমানুষ। তা না হলে অমন কেউ ভয় করে নাকী? আর যার কাছে একথা বলছি সে আমার ভাগনা হলে কী হবে, নিজেই যে কতো বিড়ি সিগারেটের শ্রাদ্ধ করে কে জানে? কাজেই মদন মুখ টিপে হাসলে।

খিদিরপুরের ট্রামে চড়লাম। তা, মদন 'কার্টসি' জানে। কন্ডাক্টার আসা মাত্রই ঝট্ করে সে দু'জনের জন্য দু'খানা টিকিট কিনে ফেললে।

বলতে হয় তাই বল্লাম—বড় অন্যায় করলি! কেন পয়সাটা দিলি?

মদনও বল্লে, তাতে কী হয়েছে?

* * *

খিদিরপুর পুলের কাছে ট্রাম আসতেই মদন বল্লে, নেমে পড়ুন মামা।

নামলাম।

গঙ্গার দিকে বরাবর একটা রাস্তা চলে গেছে। নামটা বোধ হয় মুন্সিগঞ্জ রোড।

মদন বল্লে, এই পথ দিয়ে যেতে হবে। বেশী দূর নয়, কাছেই।

রাস্তায় নেমে চক্ষুস্থির! এ রাস্তায় কোনো ভদ্রলোক থাকে নাকি? দু'ধারে চেয়েই হতাস হলাম। শুধু নোংরা বীভৎস বেশ্যার বাস। সোজাসুজি চলেছে এক একটা করগেট-ছাওয়া বস্তি আর সেই লাইন থেকেই বেরিয়ে আসছে গলিত, ঘৃণ্য দেহ-বিক্রেতা রমণীর দল। আর অবিরাম চলেছে ঝগড়া, গালাগালি।

এ পথেও বাড়ী নিয়ে কোনো ভদ্রলোক-গৃহস্থ থাকে নাকী? খানিক অবাক হলাম। মদনকে জিজ্ঞেস করলাম, আর বাসা পেলো না অন্য কোথাও তোমার বাবা! শেষে এই পাড়ায় ঘর নিয়েছে!

মদন বল্লে, কী করবে? কলকাতায় থাকতে গেলে খরচ আছে তো—

তা আছে! আর বেশী কথা কইলাম না। কারণ এসব কথা মদনকে বলে কিছু লাভ নেই।

আরো দু'পা এগুতে গিয়ে দেখি একটা কিসের কারখানা রয়েছে আর তার ধারে একটা গাছের তলায় যেন শীতলাঠাকুরের মতো কার একটা মূর্তি আছে। সেখানে চলেছে রীতিমতো জনতা আর মারামারি। কী হয়েছে ভাবছি, এমন সময় মদন বল্লে, ওসব দেখবেন

না মামা। ও রাত্রদিন এখানে চলেছে। নিন, আমরা এসে গেছি। বলে সে একটা অন্ধকার গলির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

ঢুকে পড়লাম।

মদন বল্লে, খুব আস্তে আস্তে আসতে হবে। নীচে নালা আছে। ড্রেনের জল যাচ্ছে তার ভেতর দিয়ে। যেন পা-টা পড়ে' না যায়। আর মাথা বেশী উঁচু করবেন না···লেগে যেতে পারে।

তা, সেকথা মদনের না বল্লেও চলতো। কারণ তার আগেই লেগে গেছে। একটা খোলার ছাদ এসে গলির ধারটায় নেমে পড়েছে, সেটা অন্ধকারে ততো লক্ষ্য করি নি। কাজেই ঠোক্কর খেয়ে সাবধান হয়ে গেলাম।

আর এক পা যেতেই পড়ে মরছিলাম। সেখানে নাকী একটা খানা আছে। মদন আমার হাত ধরে ফেল্লে।

একটা ছুঁচো অতি বিশ্রী শব্দ করে কোথা দিয়ে যেন সরে গেল।

মদন বল্লে, এইখানে দাঁড়ান, ঝট্ করে একটা আলো আনি। তাহলে আর অসুবিধা হবে না। বলে সে এগিয়ে গেল।

অসুবিধার আর বাকী কি রইলো? সারা পথ যখন চলে আসতে পারলাম তখন ঘরের কাছে এনে আর আলো দেখিয়ে লাভ কী?

মদনকে ধরলাম। বল্লাম, আলোয় আর দরকার নেই, চলো—

ঢুকলাম একটা বাড়ীর ভেতর। সেই করগেট ছাওয়া চাল। আর দরজার কাছে অতি নোংরা যেন চিংড়িমাছ পচার গন্ধ। ভেতরে গিয়ে ঢুকছিলাম একটা ঘরে। মদন হাঁ হাঁ করে উঠলো। বল্লে, ও ঘর নয়, ও ঘর নয়, ওসব হচ্ছে অন্য ভাড়াটেদের ঘর। আমাদের ঘর ওইখানে—

তাই হক। গেলাম মদনেরি নির্দেশ মতো। দেখি, ঝুল-পড়া মশারী টাঙানো একটা ছোট্ট এক চিলতে মাটির ঘর। তার মধ্যে

জ্বলছে একটা হারিকেন। মাথাটা তার উড়ে গেছে। আর সেই ঘরের মধ্যেই মেয়েকে বুকে করে দিদি বসে আছে। রুগ্ন কঙ্কালসার মেয়ে। আরো আশ্চর্য—সেই ঘরেই তিন-চারটে সাহেব-মেমের মতো পরিষ্কার ধবধবে ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে। ঠিক শুয়ে আছে বললে ভুল হবে। দু'জন ঘুমুচ্ছে। আর একজন কেবল চেঁচাচ্ছে আর অপরটি বায়না ধরেছে কি যেন একটা আবদার নিয়ে। আমি যে গেছি, দিদি বোধ হয় দেখতে পায় নি ; তাই আমার বর্তমানেই উন্মত্তের মতো ঘা পাঁচ-ছয় দিলে ঠেঙ্গিয়ে ওই বায়না-ধরা ছেলেটাকে।

ডাকলাম, দিদি—

দিদি বোধ হয় সচকিত হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই মদন গিয়ে বলে উঠলো, মা, মামাবাবু এসেছেন—

কে ? দিদি ঘাড় তুলে চাইলো।

—ও! তুই! আয়—আয়—বোস,...বোস—তারপর, কী করে আমাদের বাড়ী চিনে এলি ?

বল্লাম, আমি কী এলাম চিনে ? আনলো চিনিয়ে তোমার মদন ; ও যে বড্ড কালীভক্ত হয়ে উঠেছে আজকাল...

দিদি বোধ হয় কথাটা ভালো বুঝতে পারে নি, তাই চেয়ে রইলো।

বল্লাম, কালিঘাটে গিয়েছিলাম, দেখি মদনও যাচ্ছে মায়ের আরত্তি দেখবার জন্যে। ও-ই আমায় ধরে নিয়ে এল। তারপর বাড়ীতে খুব অসুখ-বিসুখ শুনছি—

—হ্যাঁ, অসুখের কী আর শেষ আছে! একটা উঠছে আর একটা পড়ছে, এই নিয়েই মারা যাচ্ছি। আজ এই মেয়েটা প্রায় পাঁচ দিন একাজ্বরী।

দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। দিদি বল্লে, ভেতরে আয়, ভেতরে আয়—বোস। ভেতরে যে কোথায় গিয়ে বসবো তা ভেবে পেলাম না। ওই যে

একচিলতে ছোট্ট রান্নঘরের মতো একটা ঘর—ওর মধ্যেই যাবতীয় সামগ্রী। সেই জলের কলসী থেকে সুরু করে কাপড়ের আলনা, তেল-নুনের ভাঁড়, বাক্স-তোরঙ্গ···ভাঁড়ার—আর এতগুলো মানুষ···কোনো কিছুই বাদ নেই। তবুও দিদির কথার মান রাখবার জন্ম আপাততঃ ভেতরে গিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়লাম। মনে হল যেন এখনি দম বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যি, ঘরের মধ্যে এতটুকু হাওয়া নেই! জানালা? জানালা তো দেখতে পেলাম না! অথচ এই মশারী—একগুলো প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস! নিজেই ঘেমে উঠলাম। জামার তলায় গেঞ্জিটা যেন সপ্ সপ্ করতে লাগলো ঘামে। আর মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ঘামে ভিজে উঠলো।

বল্লাম, এই একখানি ঘরেই তোমরা থাকো?

দিদি বল্লে, হ্যাঁ, উপস্থিত তো তাই আছি। আগে নিয়েছিলাম দু'খানা ঘর। তা, আট টাকা ভাড়া। 'ও' তিন মাসের বাড়ী ভাড়া দিলে না। কাজেই বাড়ীওয়ালা রাখবে কেন? বল্লে, উঠে যাও। কিন্তু যাবোই বা কোথা? এত সস্তায় আর কলকাতায় থাকা যায় না কি? বাড়ীওয়ালার বৌকে গিয়ে ধরলাম। ওই যে বৌ ওধার-কার ঘরে বসে আছে, বলে' দিদি কার দিকে যেন আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলো, তা বৌটি যেন লক্ষ্মীঠাকরুণ···বল্লে, আচ্ছা তাই তাই, না হয়, চার টাকাই ভাড়া দিয়ে থাকো, উঠে যেতে বলছি না, তবে একটা ঘরের বেশী তো ঘর এ-টাকায় দেওয়া যায় না। কাজেই একখানা ঘরেই সকলে মিলে পড়ে আছি।

বল্লাম, মুখুয্যে মশাই কোথায়? আর এতগুলো লোক একটা ঘরে ঘেঁসাঘেঁসি করে শোয় কেমন করে এই গরমে?

দিদি দুঃখ করলো। ম্লান হেসে বল্লে, ও শোয় ওই বাইরের খাটিয়াতে। মুখুয্যে মশাই যদি তোমার মানুষের মতো মানুষ হত ভাই তাহলে আর দুঃখ কি ছিল? যা আশী টাকা মাইনে পায় তা

থেকে তো সবই দিয়ে আসে ঘোড়ার মাঠে···কিছু কী থাকে? শুধু তাই কী? যতো বদ্‌মাইসি বুদ্ধি আর বদ্‌মাইস লোক ওর ইয়ার। এই দেখো না, এখানে মেয়েকে নিয়ে বসে আছি আর মুখুয্যে মশাইয়ের ঘোড়ার ডিম! তিনি তাস খেল্‌ছেন বাইরের রাস্তায়। বল্‌তে যাও দিকি, বলবে, যা যা, ওসব আমি জানি না—ছেলে আছে কি করতে? কিন্তু ছেলে তো ওই আমার দুধের বাচ্চা! কতো লোকের গাল-মন্দ খেয়ে কতো কষ্ট আর পরিশ্রম করে' বাছা আমার দিন মজুরের কাজ করে আসে! ওর কী এই বয়স চাকরী করবার? না, এই রকম চাকরী করলে ও বাঁচবে। বাছার কী কম দুঃখে পড়াশোনা হয় নি?

দিদি মদনকে ডাকলে। বল্লে, তোর মামাকে যাবার সময় মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি। আর ওকে গিয়ে বলবি—যাও, বাড়ী যাও, ডাক্তার বলে গেছে মেয়ে বাঁচবে না। এখন হাসপাতালে নিয়ে গেলে আশা আছে, আর তোর মামার জন্যে চা কর দিকি—

মদন একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে, উনুন কোথা? আর চিনি তো ঘরে নেই।

দিদি বল্লে, ওই বাড়ীওয়ালার উনুনে একটু জল গরম করে আন না। চিনি নেই? আচ্ছা, এই নে, দিদি আঁচল খুলে একটা পয়সা দিলে মদনকে।

বল্লাম, কেন বাড়াবাড়ি কচ্ছো? আমি তো ঘণ্টাখানেক আগে চা খেয়েই বেরিয়েছি—

তা হক, একে আবার বাড়াবাড়ি বলে নাকী? দিদি সেই বায়না-ধরা ছেলেটাকে পাখার হাওয়া করে ঘুম পাড়াতে লাগলো আর চিল-চেঁচানে ছেলেটাকে ভয় দেখালো—ওই দেখ, মামাবাবু এসেছে —আমায় নিয়ে চলে যাবে আর আমি সকলকে নিয়ে চলে যাবো, তুই একলা থাকবি ঘরে, অয় জুজু—

দেখি, জুজুর ভয়ে ভীত ছেলেটা আমার দিকে প্যাট-প্যাট করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। দিদি মারলো একটা থাব্ড়া তার চোখে। —ঘুমো না হাড়-জ্বালানে বাঁদরটা—

সেও ঘুমুবে না আর দিদিও ছাড়বে না।

বল্লাম, উনুন আজ ধরাও নি তোমরা ?

দিদি বল্লে, না, বিকেলে রান্নার পাট একরকম তুলে দেওয়া হয়েছে। এই খানিক আগে দু'-তিন পয়সার মুড়ি-মুড়্কি এনে খাইয়ে দিয়েছি কচিগুলোকে, নিজেও ওই খাবো। আর রান্না করেই-বা কে ? তা ছাড়া, তোমার মুখুয্যে মশাইয়ের দয়ায় বাজারও তেমন আসে না তো।

কথাটা খুবই দুঃখের—করুণ! কিন্তু উত্তরে কিছুই বল্লাম না।

দিদি জিজ্ঞেস করলে—আমাদের বাড়ীর সব কেমন আছে—আমার মা, আমার বাবা আরো সকলে।

সংক্ষেপে জবাব দিলাম—ভালো।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘরে থাকা সত্যই অসহ্য হয়ে উঠলো। দুর্দান্ত গরম, আর ততোধিক গুমট! হাওয়া বিহনে যেন হাঁপ্ লাগলো। বল্লাম, জানালা নেই এ ঘরের ?

আছে, দিদি বল্লে, অনবরত বন্ধ থাকে। জানালাটার পাশটা 'আওল' কিনা! মানে সাপ্-টাপ্ থাকে আর কী!

সাপ! কলকাতায় সাপ! তা বিচিত্র নয় তো। এটা যে বস্তি! ভাবলাম —এর পর আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু এতটুকু এই ঘরে জানালা না থাকায় শিশুগুলো যে কেমন করে বেঁচে আছে এই ভেবেই অবাক হলাম।

মদন এক বাটি চা রাখলো সামনে। আর একটা প্লেটে প্রায় ছ'সাতখানা লোভা বিস্কুট।

বল্লাম, এ বিস্কুট কী হবে ? আত্মীয়তা—

দিদি বল্লে, খা খা, কোনোদিন তো আসিস না গরীব দিদির বাড়ীতে।

না এলেও বিস্কুটগুলো খেতে হবে নাকী ? এগুলো আমি খাওয়ার চেয়ে—বলে দু'খানা তুলে দিলাম ওই চিল-চেঁচানো ছেলেটার হাতে। কিন্তু নিস্তার নেই।

অনেক পীড়াপীড়িতে একটা আমাকেও তুলতে হল মুখে। খেলাম ···মিয়ানো—

তারপর প্রায় দশ-বারো মিনিট পরেই উঠলাম দাঁড়িয়ে।

বল্লাম, যাই তাহলে দিদি—রাত হল।

—হ্যাঁ, আয় ; তবে মাঝে মাঝে আসিস—বাড়ীটা তো চেনা রইল। আর বেশী দূর তো নয়—কলকাতাতেই থাকিস যখন—আর যাবার সময় না হয় মুখুয্যে মশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যা—মদন নিয়ে যা তো রে !

মদনের সঙ্গেই এলাম বেরিয়ে।

যাই হক, বাইরে এসে তবু নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে মদন থামলো। বল্লে, ওই যে বাবা তাস খেলছে, আসুন মামা।

তাস খেলবার ঘটা দেখে অবাক হলাম। রাস্তার ধারে একটা মাদুর বিছিয়ে চারজন লোক অবিশ্রান্ত অশ্লীল কথা বলে যাচ্ছে আর গ্যাসের আলোয় পরীক্ষা করছে হাতের দানটা। মারছে টেক্কা, বিবি আর একবার করে কেউ ঠোঁটটা ধরছে কামড়ে, আর কেউ মশার বাপান্ত পিতান্ত কচ্ছে। এরি নাম তাস খেলা ! যতো ইতরের কাণ্ড ! ভাবলাম—মন্দ নয় ! বাড়ীতে পরিবার খেতে পাচ্ছে না, মেয়ে মরো মরো, মাথাগুঁজে থাকবার জায়গা নেই, আর বাড়ীর কর্তা চমৎকার আত্মবিনোদনের পথ আবিষ্কার করেছেন। আশ্চর্য আমাদের এই বাংলাদেশ ! একমাত্র গোবেচারী পত্নীর ভালোমানুষী আর অসহায়তার সুযোগ নিয়েই বয়ে যাচ্ছে এই স্বামীগুলো ! এদের আচ্ছা করে যদি

কোনোদিন চাবুক দিতে পারে ওই পত্নীরা আর দাবী করে তাদের সম্পূর্ণ সুখ-সুবিধা তবেই না জানি কিছুমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞান পেয়েছে মেয়েরা মনে করবো। নচেৎ করবার আর কী আছে!

মদনকে বল্লাম, দাঁড়া, একটা কথা আছে।

মদন থামলো। বল্লে, কি?

আমি তোর বাবার সঙ্গে দেখা করবো না—বল্লাম, আমার কাজ আছে, আমি যাচ্ছি।

—সে কি! এতখানি এলেন! আর ফিরে যাবেন! মদন রীতিমতো অবাক হল আমার কথা শুনে।

বল্লাম, হ্যাঁ, যাবো, তোর বাবার সঙ্গে সত্যিই তো আমার এমন বিশেষ দরকার নেই, তবে তুই যা, যা বলতে বলেছে দিদি বলগে যা।

মদন বল্লে, সে তো যাবোই, কিন্তু বাবার সঙ্গে কীরকম একটা ঝগড়া হত দেখে যাবেন না? নিশ্চয় আপনি রাগ করেছেন আমাদের ওপর, না? সত্যি, আপনার কিছুই যত্ন হল না কিন্তু!

বাধ্য হলাম হাসতে। বল্লাম, যা বলেছিস, বলেছিস। কিন্তু এমন কথা আর বলিস নি তোর মামাবাবুকে।

একটু থেমে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিলাম—বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই মদন। আর সে ঝগড়া দাঁড়িয়ে আমি শুনবো, এমন কোনোদিন ভাবিস নি। আচ্ছা, চলি,···বলে এগিয়ে এলাম। কিন্তু এগুলেও জানি, মদন বোধ হয় সহজে রেহাই দেবে না ওর বাবাকে। নিশ্চয় ওই কুৎসিত লোকগুলোর সামনে মদন লাগাবে চেঁচামেচি আর গোলমাল। কিন্তু তাতে আমার আর কি এসে যাচ্ছে? একটু এগিয়ে গেলেই তো পাব বাস-ট্রাম। আর নিঃশ্বাস নেবার মতো অফুরন্ত হাওয়া আর চলন্ত পৃথিবী!

প্রেমিকের মৃত্যু

হঠাৎ ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে পুলক পিছ্‌লে পড়্‌লো দু'হাত পিছনে। যেন সে এক ভয়ংকর মূর্তি দেখেছে···যেন এক বিভীষিকা! হ্যাঁ, ভয়ংকরই বটে! ভীষণ···

স্বপ্না বসে গল্প করছে আর হাস্‌ছে তার বৌদিদিদের সংগে! স্বপ্না! সেই পাঁচ বছর পূর্বের স্বপ্না! যাকে সে গড়ে তুলেছিল তার কল্পনা আর স্বপ্ন দিয়ে। সেই স্বপ্না আজ তারি ঘরে এসেছে বেড়াতে এক সুদীর্ঘ দিনের পর। আশ্চর্য হয়ে গেল পুলক শুধু স্বপ্নার দিকে ক্ষণকালের জন্য চেয়ে। তারপরই পাশের ঘরে এসে বসে পড়লো সে, আর ভাবলো, বিয়ের পর যে মেয়েদের এমন বীভৎস দেখতে হয় এ দৃষ্টান্ত যেন স্বপ্নাই আজ বয়ে এনে ধরেছে তার সামনে। বীভৎস নয় তো কী? যে মেয়ের চোখে ছিল একদিন বিদ্যুৎ, দেহে ছিল একদিন জলন্ত লাবণ্য, কথায় ছিল একদিন বীণাস্বর, সে আজ যেন হয়ে গেছে ঈশ্বরের এক বিকৃত সৃষ্টি! হয়ে উঠেছে স্থূলকায়, মুখের ভিতর এক পুঁটুলি পান, চোখের দু'পাশে কালি, কথায় কাতরতা! আর, আরো আশ্চর্য স্বপ্না আজ তার কাকী-মা···

তার প্রিয়া নয়, তার বান্ধবী নয়, তার সহপাঠিকা নয়, একেবারে সকলের উর্ধ্বে—মা···কাকী-মা···

হাস্‌লো পুলক…কিন্তু ক্ষণেকের জন্ম…

তারপরই সেই হারানো দিনের উদগ্র স্মৃতিটা যেন জেগে উঠ্‌লো দপ্‌ করে' তার মনের মধ্যে আগুনের মতো।

রংগমঞ্চে পুলক আর স্বপ্না…

পাশাপাশি দুখানি বাড়ী। পুলক থাকে এ বাড়ীতে আর স্বপ্না থাকে পাশের বাড়ী। ছোটো বেলা থেকে সবার অজ্ঞাতে তাদের মধ্যে কেমন এক সৌহার্দ গোড়ে উঠ্‌লো…স্বপ্নার মা ভালোবাস্‌তো পুলককে আর পুলকের মা স্বপ্নাকে! তারপর দেহে যখন দু'জনার এল যৌবনের বন্যা, তখন দু'জনেই কল্পনা কর্‌লো দু'জনকে বিয়ে কর্‌বে। কিন্তু হল না। হঠাৎ একদিন একটা জ্যোতিষী এসে বল্লে,—স্বপ্নার সংগে পুলকের হতে পারে না বিয়ে। কেন পারে না—তার সে কারণও দেখালো অসংখ্য আর সেই অসংখ্য কারণই পেল প্রাধান্য বড়দের পক্ষ থেকে।

তারপর একদিন বেজে উঠ্‌লো সানাই। আর হোগ্‌লা দিয়ে ঘেরা হ'ল স্বপ্নাদের ছাদ।……স্বপ্নার বিয়ে। আর সকলের চেয়ে মজার হচ্চে—স্বপ্নাকে যে বিয়ে কর্‌তে এল, সে হচ্চে পুলকের দূর-সম্পর্কের এক কাকাবাবু। বেশ নেড়া নেড়া গোবেচারা, গায়ে বগলে চতুর্দিকে বন-মানুষের মতো চুল আর মত শুন্‌লে তার, অবাক হয়ে' যেতে হয়। বলে—মেয়েদের লেখাপড়া? ঝাঁটা মারো…ঝাঁটা মারো! ও রবি ঠাকুর আবার কবি নাকি? হুঁ হুঁ, সব কেচ্ছা আমার জানা আছে।…বৌ কর্‌বো তো মার দিয়ে বশে রাখ্‌বো ইত্যাদি ইত্যাদি। এহেন লোক হল স্বপ্নার মতো মার্জিত এক মেয়ের বর। কাযেই কাকা হলে'ও পুলক তাকে সহ্য করলো না বরং দ্বিগুণ উৎসাহে বিয়ের রাত্রেই গিয়ে স্বপ্নাকে টেনে নিয়ে গেল আড়ালে আর বল্লে, স্বপ্না, এখনো সময় আছে, পালিয়ে যাবে?

কিন্তু তার উত্তরে স্বপ্না তাকে যে কথা শোনালো তাতে সে রীতিমতো কাবু হয়ে' পড়্লো আর তার ব্যথা লাগলো অন্তরে। স্বপ্নাও যে একথা বল্‌তে পারে, তা তার ধারণা ছিল না।

স্বপ্না কঠিন হয়ে বল্লে, কেন পালাবো? বাপ-মা এত পয়সা খরচ করে যে বিয়ের আয়োজন করেচে, সে কী আমার পালাবার উদ্দেশ্যে? পালাবে তারা, যারা হিংসুটে! যেমন তুমি···অর্থাৎ আমার বিয়ে হচ্চে এটা তোমার সহ্য হচ্চে না···

বেশ, ভালো কথা! সেই রাত্রেই পুলক পালিয়ে এসেছিল বাইরে। বাড়ীতে নয়। তারপরই গিয়েছিল লালবাজারে নাম লেখাতে যুদ্ধে যাবার জন্য। কিন্তু লালবাজার কেন তাকে গ্রহণ করে নি, সে-খবর আমাদের অজ্ঞাত। তারপরই সকালে একটা ফুল দিয়ে মোড়া ময়ূরপংক্ষী-মোটরে করে যখন তার সুযোগ্য কাকাবাবু আর স্বপ্না চলে' গেল, তখন সে মাত্র লুকিয়ে দেখেছিল দৃশ্যটুকু। তারপর তার সেই কাকাবাবু থাকেন ঝরিয়ায়···স্বপ্নাও নিশ্চয় সেখানে ছিল। আজ হঠাৎ সেই পাঁচ বছর পরে আবার স্বপ্না তার বাড়ীতে এসেছে বেড়াতে!

যেন সে এক ভয়ংকর মূর্তি দেখেছে···যেন এক বিভীষিকা! হ্যাঁ, ভয়ংকরই বটে! ভীষণ···

স্বপ্না বসে গল্প করছে আর হাসছে তার বৌদিদিদের সংগে। সেই পাঁচ বছর আগের স্বপ্না···

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো পুলক। না, এ আবহাওয়ার মধ্যে তার পক্ষে বসে' থাকা অসম্ভব। কী জানি যদি ফের স্বপ্নার সামনেই তাকে পোড়ে যেতে হয়। কিন্তু না, সে অপমান সে আজ কিছুতেই ঘটতে দেবে না। স্বপ্নার আর কী! বিয়ে করেছে···গিন্নী হয়েছে···নিশ্চয় ও বাল্যের ভাবপ্রবণতাকে ধিক্কার দিয়েছে। আর উঠে ঘরগুলোর

বেড়াতেই তো পারে এখনি। ও তো এসেছেই এখানে বোধ হয় এই করতে। কিন্তু পুলকের পক্ষে একটা সম্মানহানির ভয় আছে বৈকি ! আর তার যে সবচেয়ে বড় গর্ব—আজো সে অবিবাহিত !

পুলক আর দাঁড়ালো না। একেবারে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। তারপরই রাস্তায়···

সন্ধ্যায় যখন ও বাড়ীতে ফিরে এল তখনো মনে মনে ভয় ছিল —কী জানি, যদি স্বপ্না এখনো থাকে ! কিন্তু না, সে ভয় প্রথমেই ভেংগে দিল ওর ছোটো ভাই। বল্লে, কাকী-মা তো অনেকক্ষণ চলে গেছে···ওরা এখন কল্‌কাতাতেই থাকবে দিন দশেক। বেড়াতে এসেছে। এই ডাক্তার লেনে বাড়ী-ভাড়া করেছে। তোমায় অনেক করে যেতে বলেছে কাকী-মা...

কী বল্‌লি ? পুলক একবার তীক্ষ্ণ চাহনি ফেল্‌লো ভাইয়ের ওপর। তার পরই একটা 'হুঁ' বলে সোজা ওপরে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো। এতক্ষণ পরে তার স্বস্তি। আরো ভালো করে' স্বস্তিটা পাকিয়ে উঠেছে এই জন্য যে, কী ভাগ্যি স্বপ্না এ-বাড়ীতে এসে থাকে নি ! তা হলে মুস্‌কিল কী কম হত না কি ?

জলটল খেয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে পড়তে বস্‌লো পুলক।—তার এখন ফিপ্‌ত ইয়ার হচ্ছে। একটা ভালো প্রবন্ধ লিখ্‌বে বলে' টেবিল খুলে খাতা নিতে যাচ্ছে এমন সময় দেখতে পেলে সেখানে একটা লেফাফা। আর, আরো অশ্চর্য, লেফাফাটার গায়ের ওপর মেয়েলী হাতে তারি নাম লেখা। লেফাফাটা যে ডাকযোগে আসে নি, সেটা সহজেই বুঝতে পারা গেল। কারণ তাহলে টিকিট বা পোস্ট অফিসের ছাপ্‌ থাকৃতো। কিন্তু সেসবের কিছু বালাই নেই। অনুমান করতে মোটেই কঠিন হল না পুলকের পক্ষে যে লেফাফাটা কে রেখে গেছে। আর তার দুঃসাহসকেও বলিহারী !

পুলক উপস্থিত তার পাঠ্য-পুস্তক পড়বার ইচ্ছা স্থগিত রাখলো। সব সরিয়ে দিয়ে সে তুলে নিলে লেফাফাটাকে হাতের ওপর। আর ভেবে অবাক হয়ে গেল---এর মধ্যে কী লেখা থাকতে পারে! একটা তীব্র ঔৎসুক্য তাকে অস্থির করে তুললো। আর তারপরই দ্বিধাহীন চিত্তে মরিয়া হয়ে ছিঁড়ে ফেললো লেফাফাখানা। ভিতর থেকে বেরুলো একখানা প্যাডের কাগজ! তার ওপর গোটা পাঁচ লাইন লেখা। তলায় সই করেছে স্বপ্না। হাঁ, স্বপ্নারই নামসই বটে! কিন্তু লিখেছে কী? এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্‌লো পুলক :—লিখেছে স্বপ্না—

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে তোমাকে গোপনে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করতে চাই। ভীষণ কৌতূহল হল' আমার জান্‌বার—আচ্ছা, আজো কী তুমি আমায় ভালোবাসো? দয়া করে' আমার নিচের ঠিকানায় যদি প্রশ্নের উত্তর পাঠাও তা হ'লে সত্যই খুশী হব। —ইতি স্বপ্না।

চিঠির নিচে এক কোণে একটা ঠিকানাও আছে বটে! পুলক পড়ে' দাঁড়িয়ে উঠলো। এর পর যে কী সে করতে পারে, যেন তার মাথায় এলোই না। প্রথমে হল তার রাগ, পরে হল' তার ঘৃণা তারপর হল' তার অভিমান আর সর্বশেষে জাগলো তার প্রতিহিংসা। একটা মেয়ের লজ্জার সীমা থাকা দরকার। এই চিঠি নিয়ে অতি সহজেই পুলক যেতে পারে তার সুযোগ্য কাকাবাবুর কাছে। আর তাকে দেখাতেও পারে পত্নীর বেহায়াপনা। এটা একবার ভাবা উচিত ছিল অন্ততঃ স্বপ্নার। বা সহজ মনে একটা ভয়ও তো হওয়া উচিত ছিল তার। কাকীমা! হাঁ, কাকীমাই যদি সে আজ হয়, তাহলে' শাস্ত্রে এমন কথা লেখা নেই যে, স্বামী ব্যতিরেকে অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করতে পারা যায়, তুমি আমায় আজো ভালোবাসো কিনা! আর একথা জিজ্ঞেস করবার তার অধিকার কী? ঠাট্টা·· রসিকতা···

পুলকের কান্না পেয়ে গেল। অনেক দুঃখে তার কান্না পেল! কী ভুল-ই সে করেছিল এই ধাঁজের মেয়েকে ভালোবেসে! এখন তার ইচ্ছা হল' এই মুহূর্তে'ই স্বপ্নার কাছে গিয়ে যেন সে বলে -কেন? কেন? দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে একথা গোপনে জিজ্ঞেস করতে কে তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছে? আর কেনই বা তোমায় আমি ভালো-বাসবো? তুমি, কী-এমন উর্বশী বা আর্টিমিষ? মেয়েছেলের সুযোগ নিয়ে যদি পুরুষকে এই ভাবে ঠাট্টা করবার ইচ্ছা হয়, তা হলে ওর রীতিমতো শাস্তি হওয়াই উচিত! আর সব চেয়ে শাস্তি দেওয়ার ভার তো পুলকেরই হাতের মুঠোয়! দিক চিঠিখানা সে ছিঁড়ে ফেলে; করুক কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো। তারপর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিক স্বপ্নার চোখের সাম্‌নে। বাতাসে উড়ে উঠুক সেই কাগজের কুঁচোগুলো। আর সেই হবে স্বপ্নার প্রশ্নের একমাত্র যোগ্যতম জবাব।

কিন্তু না! সভ্য উপায়ে তাকে দেওয়া যায় না এ শাস্তি। আরো একটু মোলায়েম অথচ বেশ একটু কড়া উপায়ে তাকে ব্যথা দিতে গেলে উচিত হচ্চে চিঠি লেখাই। আর চিঠির মধ্যে এমন কটি কথা লেখা থাক্‌বে যাতে করে' না কী স্বপ্নার মনের মধ্যে আসে বেশ নূতনতর এক জ্ঞান। আর সে-জ্ঞান হবে পুরুষের সম্বন্ধেই!

হ্যাঁ, চিঠিই সে লিখলে। অতি সংক্ষেপে আর অতি সংগোপনে। তারপর চুপি চুপি তার ভাইকে ডেকে কানে কানে কী সব বল্লে···

এধারে স্বপ্নার কথাও বলি:—

চিঠির জবাব সে পেল। আর খুলেও পড়্‌লো।

পুলক লিখেছে মাত্র কয়েক ছত্র। লিখেছে:

তোমার চিঠির নির্লজ্জ ইঙ্গিতটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে যে কথাটি জিজ্ঞেস্ কর্‌বার জন্ম তুমি সহসা আহার

নিদ্রা ত্যাগ করেছো আর মনের মধ্যে ভীষণ কৌতূহল গোড়ে তুলেছো সেটা গোপনে জিজ্ঞেস্ করবার-ই বা কী দরকার বা জিজ্ঞেস্ করবার অধিকার-ই বা কোথা থেকে পেলে বা আমাকেই সে কথা জিজ্ঞেস্ করতে চাও কেন, তাও আমার বোঝার শক্তি নেই। তবে এইটুকু বললেই আমার বক্তব্যকে আমি যথেষ্ট মনে করি যে তোমার প্রেমিক বা তোমায় যে ভালোবাস্তো তার মৃত্যু হয়েছে পাঁচ বছর আগেই। ইতি…

কিন্তু এ চিঠি পড়েও স্বপ্নার হাত কাঁপে নি; বা আকাশের দিকে চেয়ে সে উন্মনা হয়ে ওঠে নি; বা তার মুখের হাসি সহজে মেলায় নি।…লাইনগুলো তার কাছে বেশ উপভোগ্য বলেই মনে হল; এবং সে ভাবলো—কথাগুলো পীড়াদায়ক হলেও আর যাই হ'ক পুলকের কবিত্ব আছে!

টেলামাইট

পাশ করা উকিলেরই কিছু হয় না তারপর আবার তার মুহুরী! হাসি পায় মেঘেনের। কিন্তু কিছু না পেলেই বা চলে কী ক'রে? পেট তো আছে! বাড়ীওলাকে না হয় ফাঁকী দিলে, না হয় মুদীর দোকানের কিছু মারলে, দাড়ীকামানো নাপতেকে না হয় কলা দেখালে, কিন্তু পেটকে কী বল্‌বে? তার কাছে পার পাওয়া যায় কী? অথচ পেট ছাড়াও সংসারে এমন কতকগুলো জিনিষ আছে যেগুলো হাজার তুচ্ছ হলেও তা থেকে নিস্তার পাবার জো নেই।

মেঘেন তিন তলার একখানি ঘরে থাক্‌লেও দু'তলার কথা ভুল্‌তে পারে না। এম-এ কোর্‌সের নোট মুখস্থ কর্‌তে করতেও তার মনে ভেসে ওঠে দোতলার বৌটির মুখখানি। অত্যন্ত সাদাসিদে···বাঙ্গালীর ঘরে মেয়েদের মুখ যেমন হয় অথচ সে মুখের এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা আছে, যা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয় ভালোবাসতে। আর রূপের দিক দিয়েও ও পার্বতী—মেঘেন ভেবে পায় না—এ মেয়ে কেমন করে পড়লো এসে ঐ মুহুরীর হাতে। কী কষ্টই না সইছে! সেদিন বারান্দায় পায়চারী করতে করতে—এখনো বেশ মনে আছে—মেঘেন দোতলার ওই বৌটিকে দেখে কী আশ্চর্যই না হয়েছিল। সন্ধ্যা বেলা গা ধুয়ে উঠছে ও···অথচ দেহের লজ্জা

ঢাকবার উপযোগী একটা গোটা গামছাও নেই। সে কষ্ট যদি অন্য কেউ দেখতো! মেঘেন ভাবে আর পড়ায় মন দেয়।

হঠাৎ সেদিন রাত্রে মুহুরীর চীৎকার শুনে মেঘেন জেগে উঠলো। রাত্রি প্রায় বারোটা হবে। অক্ষয় বাবু চেঁচাচ্ছেন: খবরদার বল্‌ছি, বাপের বাড়ীর যা টাকা আছে দিয়ে দাও, তা না হলে ভালো হবে না বলছি; তোর ভাই আজ এসেছিল না?

বৌ আস্তে আস্তে কী বললে, অক্ষয়বাবু উঠলেন তেলেবেগুনে জ্বলে!

এমন প্রায়ই হয়···

মেঘেন জোর করে ঘুমোবার ভাণ করলে—তা ছাড়া উপায় কী? গরীব হলে মানুষ অনেক রকম মূর্তিই ধরে। কিন্তু একটা কথা মেঘেনকে ভীষণ ভাবিয়ে তুললো। সামান্য কথা, অথচ তাতে আছে দারুণ কৌতূহল, আনন্দ। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? মেঘেন ভেবে দেখলে তার অনেক টাকা আছে, বাস্তবিকই সে তো জমিদারের ছেলে; এখন ইচ্ছা করলেই তো সে দিতে পারে অক্ষয় বাবুকে ছ'পকেট ভর্তি করে কিছু টাকা। তবে দান বলে নয়। কারণ দান জিনিষটা দাতার পক্ষে গৌরবের হলেও গ্রহীতার পক্ষে নয়। দিতে পারে কৌশলে। বলবে একটা মামলার কথা। মুহুরী মানুষ নিশ্চয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। তারপর মেঘেন দেবে খরচার টাকা আর নিশ্চয় সে টাকায় প্রথমেই অক্ষয়বাবু কিনে দেবেন বৌটির ছ'খানা সাড়ী, তারপর সামান্য অন্য কিছু···তারপর···ইত্যাদি ইত্যাদি···

সকাল বেলা উঠেই মেঘেন দোতলার দ্বারে গিয়ে হানা দিলে।

—ও মশাই! অক্ষয় বাবু! শুনছেন?

অক্ষয় বাবু কোনো মক্কেলের গলা ভেবে টপ করে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু যতখানি উৎসাহ নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন মেঘেনকে দেখে তত উৎসাহ আর রইল না।

মেঘেন বললে: নমস্কার···দেখুন একটা ভীষণ মামলায় পড়ে গেছি···কথাটা সে এমন ভাবে বললে যেন মনে হল শরীরের কোনো জায়গায় তার দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে।

অক্ষয় বাবুর মন বোধ হয় নেচে উঠল, তাই তিনি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন।—কুচ পরোয়া নেই, আসুন আমি বিনা পয়সায় করে দেব···আপনি আমার বাড়ীর লোক, হুঁ···হুঁ···যা তা ঠাউরেছেন!

বলেই গয়ার পাণ্ডার মত মেঘেনের হাতটা ধরে টেনে আনলেন। তারপরই আবার চীৎকার—ওরে ও বুঁচকী! দু'কাপ চা আন্ না!

বুঁচকীটা কে মেঘেন ভাবছে—এমন সময় অক্ষয় বাবুই তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন—ও আমার স্ত্রী···নাম শুনে যেন আশ্চর্য হবেন না, হ্যাঁ তারপর সুরু করুন দিকি!

প্রথমটা মেঘেন আম্‌তা আম্‌তা করল—কারণ, কী বল্‌বে ভেবে পেল না—কিন্তু শেষ কালে ভেঁজে নিল। বললে—হ্যাঁ দেখুন··· বলছিলাম কী, এমন বিশেষ কিছু না যদিও, তবু বলি শুনুন, একটা মামলার নথিপত্র আছে আমাদের বংশের, সেটা উপস্থিত হারিয়ে গেছে, তা শুনেছিলুম ছোট বেলায় সেটা নাকী কোন্ এটর্ণী চুরী করে রেখেছে, তাই যদি হয় তা হলে সে এটর্ণীকে কী খুঁজে বার করতে পারা যাবে বা তার নামে কোন কেস্‌টেস্ এনে···

মেঘেন আপন অসম্পূর্ণতার ভয়ে চাইল অক্ষয়বাবুর দিকে। অক্ষয়বাবু তাতে ভড়কালেন না দেখা গেল। একটু ভেবে বললেন—তা আর শক্ত কী? এটর্ণী ত দূরের কথা, তার বাপকে ধরে আনা যায় পয়সা থাকলে! আপনি বলেন তো এখনি সি আই-ডি অফিসে আমি ফোন কচ্চি···এখনি বড় বড় ব্যারিষ্টার এনে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করব, ভাবছেন কী? গেল বছর কী হয়েছিল জানেন? একজন ব্রহ্মচারী পড়েছিল মেয়ে চুরীর মামলাতে, তা মেয়েটাকে যে কোথায় লুকিয়ে

রেখেছিল তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় নি ; তারপর হুলিয়া বেরুল ; অপরেশ রায় গভরমেণ্টের তখন বড় ব্যারিষ্টার, আমার পিট চাপড়ে বললেন—নাও হে, বড় দাঁও আছে ! এই বাজারে সি-আই-ডি হয়ে যাও ···বার করে আনো। তা আমি অক্ষয় ভড় বাবা !·· হুঁ হুঁ·· গেলাম সন্ন্যাসী বেশে কাশীতে ; তারপর আর কী···ধরলাম মেয়েটার চুলের মুঠি ! তারপর অনেক কথা···যাক্ আপনি ভাবেবেন না, সব ঠিক করে দেব। তবে কথা হচ্ছে···এটর্ণীর বাসার একটু আন্দাজ দিতে পারেন কী ? আর—হ্যাঁ, নথিপত্রে কী সব ছিল সেটুকুও একটু বলতে হবে তো···

মেঘেন পড়ল ফাঁপরে। মামলা মোকদ্দামা সম্বন্ধে সে একেবারে শিশু। আর এ যা প্লট সে ফেঁদেছে—আসলে আইনের কোঠাতেই পড়ে না। কী করে ? বললে—তা অত ব্যস্ত হবার কারণ নেই ! ভেবে বলব ; তবে খরচাটার একটু আইডিয়া দিন দিকি।

—খরচ', হ্যাঁ খরচা ! পড়বে একটু···দাঁড়ান আমি হিসেব কচ্চি। বলেই ঝট করে অক্ষয়বাবু উঠে গেলেন তারপরই এক টুকরো কাগজ এনে হিসেব করতে বসলেন—ব্যারিষ্টারের সঙ্গে কন্‌সালটেসন্ ফি হচ্চে—৩২৲ টাকা।

সি-আই-ডি ফি—১০৲ টাকা।

তারপর, রিসিভার ফি—১৫০৲ টাকা। ইত্যাদি ইত্যাদি করে সব শুদ্ধ পড়বে প্রায় দুশো টাকা। তা কমসম করে ঠিক করতে চেষ্টা করব। অক্ষয়বাবু অভয় দিলেন।

মেঘেন মনে মনে হাসলো। নিশ্চয় অক্ষয়বাবুর আফিমের পরিমানটা আজ সকালে বেশী হয়ে গেছে। তা না হলে এমন যুক্তি কোনো গেঁয়ো মুহুরীও দিতে পারে না। বললে, আপনি বাড়ীর দালালি-টালালি করেন কী ?

—দালালি! কেন বলুন তো…এ কথা জিজ্ঞেস্ কচ্ছেন কেন বলুন তো? অক্ষয়বাবু আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

—মানে, একখানা বাড়ী আমার কেনবার দরকার হয়ে পড়েছে —তা, আপনার হাত দিয়ে স্থবিধা মতো পাই তো মন্দ কী?

—নিশ্চয় পাবেন, নিশ্চয় পাবেন। উল্লাসে অক্ষয়বাবু যেন আর্তনাদ করে উঠলেন—ওরে ও বুঁচকী! তোর চা কী এখনও হল না, না কাণে শুনতে পাস নি? অক্ষয়বাবুর চোখের কোণে আনন্দাশ্রু।

শুনতে বুঁচকী অবশ্যই পেয়েছিল; তাই সঙ্গে সঙ্গে কাপ বিহনে কলাইকরা বাটির দু'বাটি ভর্তি চা এনে হাজির করলো।

আর অক্ষয়বাবু উঠলেন রেগে।—কেন? কাপ ছিল না বাড়ীতে? আনি নি কিনে? অ্যা! কী নেকী বৌরে বাবা! অ্যা!

বলেই একটু থেমে হঠাৎ আচমকা বুঁচকীর হাতটা ধরে আকর্ষণ করলেন। বল্লেন, দেখ্, রাজাবাবু এসেছেন, এঁকে চিনিস্? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কী? নে, প্রণাম কর, দুঃখ ঘুচে যাবে। বলেই জোর করে মেঘেনের পায়ের ওপর বুঁচকীকে ঠেলে দিলে। বুঁচকী অবশ্য পায়ের ধূলা নিতই, কিন্তু মেঘেন দিল না। হাঁ হাঁ করে উঠল।

অবশ্য জিনিষটা মেঘেনের চক্ষে ভাল ঠেকল না, আর ঠেকতেও পারে না। কারণ যেহেতু সে আর যাই হক—মক্কেল। আর মক্কেলের পায়ে কে কোথায় কার স্বামী তার স্ত্রীকে প্রণাম করতে বলে?

মেঘেন দাঁড়ালো। কী, চল্লেন নাকি? হতাশ ভাবে অক্ষয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

—না যাব না, তবে কতকগুলো খরচার টাকা আপনাকে আমি এখনি দিতে চাই, বলেই গমনোদ্যতা বুঁচকীর দিকে একটা করুণার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে মেঘেন।

—কিন্তু বাড়ীর সম্বন্ধে কী করবো—সেটা বলুন না! অক্ষয়বাবু উত্তর চাইলেন।

—আমি তো রয়েছিই এখানে···সময় বুঝে করা যাবে।

—বেশ বেশ, চা-টা খেয়ে নিন; বলে অক্ষয়বাবু নিজেই চায়ের বাটিটা মেঘেনের হাতে তুলে দিলেন।

মেঘেন চা খেয়ে ওপরে গিয়ে অক্ষয় বাবুর হাতে দিলে বত্রিশ টাকা। বল্লে, উপস্থিত এইটে নিন, তারপর পরে আবার দেব। দেখবেন যাতে নথিপত্র পাওয়া যায়···

অক্ষয়বাবুর একগাল হাসি! নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলে তিনি নেমে এলেন।

তারপর সেদিন দুপুরে দেখা গেল অক্ষয়বাবুদের বাড়ীতে এসেছে বসন্ত। দু'চারখানা শাড়ী এসেছে, বাজার থেকে এসেছে তিন টাকা সেরের গলদা চিংড়ি। রান্নার গন্ধে বাতাস উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আর অক্ষয়বাবু আস্ফালন কচ্চেন, কোনো শালাকে আমি পরোয়া করি? ওরে ও বুঁচকী, তোর নামে যে একখানা রেঞ্জার্স´ টিকিট কিনেছি, কী উঠবে বলতো রে?···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আর যাই হ'ক, উপভোগের দিক দিয়ে মেঘেন আজ জয়ী—এ কথা সে স্বীকার করবেই। মামলা তার যে কতোখানি তা সে নিজে জানে, আর চালাক হলে অক্ষয়বাবুও জানতে পারতেন, কিন্তু সে জন্য কথা নয়, কথা হচ্চে একটা সংসারে আনন্দ আনা নিয়ে। তুমি বড়লোক, তোমার বাড়ীতে অনন্তকালের জন্য আনন্দ চলবে, আর অন্য এক গরীব-বাড়ীতে দুঃখের অশ্রু নামবে—এ অবশ্য সংসারের নিয়ম হতে পারে, কিন্তু তা হলেও যদি এতটুকু ক্ষমতা থাকে

তোমার অপরকে কিছু দেবার, তবে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার তোমার কী অধিকার থাকতে পারে? অন্ততঃ এদিক দিয়ে মেঘেন একটু যাচাই না করে ছাড়বে না।

দু'এক দিন পরের কথা। রাস্তায় বেরুতে যাবে এমন সময় সাম্‌নাসাম্‌নি অক্ষয়বাবুর সঙ্গে মেঘেনের দেখা। অক্ষয়বাবু বোধ হয় ভড়কে যাচ্ছিলেন, কারণ এখনি জবাবদিহি করতে হবে বলে, কিন্তু সে অবসরও মেঘেন তাঁকে দিল না। হেসে জিজ্ঞাসা করলো—কেমন আছেন?

আজ্ঞে হাঁ—ভালো। অক্ষয়বাবুর একমুখ হাসি।

তা কৈ? আর টাকা নিচ্ছেন না যে? মেঘেন জিজ্ঞাসা করলো।—এখনো তো মামলার কিছুই হয় নি, নিন খরচা···

কিন্তু···অত্যন্ত সঙ্কুচিত হবার ভাণ করে অক্ষয়বাবু মাথা চুলকাতে লাগলেন। বল্লেন, মামলাটা একটু জটিল কিনা···এখনো পরামর্শ চলছে, তা···

—তা লজ্জার কী আছে? মেঘেন বেশ হাসিমুখেই বল্লে, এখনো টাকা খরচ করতে আমি প্রস্তুত। এই নিন ত্রিশ টাকা। বলেই সঙ্গে সঙ্গে সে পকেট থেকে তিনখানা দশ টাকার নোট বার করে অক্ষয়বাবুর হাতে গুঁজে দিলো, আর অক্ষয়বাবু আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন।

•

এরপর প্রায় মাস ছয়েক কেটে গেল। এখনো মেঘেনের দান সমানভাবেই চলেছে। কিন্তু সে দেখে একদিন আশ্চর্য হয়ে গেল যে সংসারের দৈন্যদশার যেন এতটুকু শেষ হয় নি বরং এই ক'মাসে বেড়ে গেছে। বুঁচকীর অসুখ হলে অক্ষয়বাবু ডাক্তার ডাকেন না। আবার তার পরণের শাড়ীর সেই অবস্থা, আবার তার গামছার

সেই অবস্থা—আচ্ছা এর কারণ কী? মেঘেন ভাবলো, লোকটা চরিত্রহীন না কী? ঘরে ফেরে তো দেখি অনেক রাত্তিরে। আবার শোনা যাচ্চে রেস্‌ খেলে। কারণ মাঝে মাঝে শনিবার পরিবার-পীড়নও চলে। হয়তো বা মদ খায়, তার ঠিক কী? মেঘেন একটা নির্বিবাদী সংসারের সুখের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে, কিন্তু যদি সেই অর্থ তার সৎপথে না যায় তাহলে নিশ্চয় দুঃখের সীমা থাকবে না।

একদিন বেলাবেলি হঠাৎ সে পাকড়াও করলে অক্ষয়বাবুকে খুব কড়া মেজাজে এবার জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ মশাই, মামলার কতদূর? কিছু হদিস পেলেন?

—আজ্ঞে না, টাকা তো জলের মত খরচ কচ্চি কিন্তু কৈ? বলতে গিয়ে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে খানিকটা মদের ঝাঁঝাল গন্ধ বেরিয়ে এল।

এবার সত্যই রেগে উঠলো মেঘেন। বললে—তা নাহয় হল, কিন্তু রাত্তিরে থাকেন কোথায়? এধারে বাড়ীতে তো কেউ না কেউ আপনার অপেক্ষায় থাকে তা, তাকে সুখী করা আপনার কর্তব্য নয় কী? এত পয়সা কড়ি উপায় করেন অথচ পরিবারের এক জোড়া শাড়ী কিনে দিতে পারেন না?

মনের কথাটা বলে ফেলেই মেঘেন সত্যি সত্যি দারুণ অপরাধীর মত লজ্জিত হয়ে উঠল। বাস্তবিকই তো! পরের পরিবার যে অবস্থায় থাকুক না কেন তাতে তার কী?

অবশ্য এ কথার পর কোন স্বাদু উত্তর অক্ষয় বাবুর কাছ থেকে পাওয়া শক্তই মনে হচ্ছিল কিন্তু আশ্চর্য—অক্ষয় বাবু হাসলেন। বললেন, আমার পরিবারের চিন্তা আপনাকে বেশ চিন্তিত করেছে দেখছি—কিন্তু কী করবো বলুন? বরাৎ খারাপ! তা না হলে আমার মত গরীবের ঘরে না পড়ে আপনার মত একজন স্বামীর হাতে পড়লেই ভাল হত। আর শাড়ী…

মেঘের গর্জন করলো: থামুন, ও কথা আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই নি। তবে একটা কথা আপনাকে বলি শুনুন—টাকা আমি হিসেব করে দেখেছি—আপনাকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে; সে টাকা পেয়ে কোনোদিন আমার মামলার তদ্বির করেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—আর চালাক হলে বুঝতেই পারতেন যে সে টাকা একটা ছল করে আপনার খরচের জন্যই দিয়েছি—দিই

কোনো মামলার জন্য—তবে খরচটা কিসে করেছেন সেটার একটু আন্দাজ দিন দিকি আমায়!

অক্ষয় বাবু এবার যেন কেমন ক্রুর হয়ে উঠলেন—উঠলেন গম্ভীর হয়ে। বললেন, যে কারণেই হ'ক খরচ আমি করেছি—আর সে চালাকীটুকু আমারি নিজস্ব—তবে কোনোখানে যদি আপনার যন্ত্রণা থাকে—তা হলে সেটার আমি আরাম করে দেব বলে আশা করতে পারি।

কী কথার কী জবাব! মেঘেন আশ্চর্য হয়ে গেল। সে আরও জ্বলে উঠল। চীৎকার করে উঠল—বুঝেছি, যে কারণেই হ'ক অর্থটা ছিল না আমার খোলামকুচি। যদি কোন অন্যায়েরি ধার ঘেঁসে তার আশ্রয় হয়ে থাকে তবে ভবিষ্যতে যাতে না হয় তার চেষ্টা করবো।

বলেই সে হন্ হন্ করে অক্ষয় বাবুকে ছেড়ে নিজের ঘরে এসে দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শুলে কী হবে—তখনই তাকে উঠে বসতে হল। নীচে কুরুক্ষেত্র লেগে গেছে।

অক্ষয়বাবু লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন—তোর গুষ্টির কাঁথায় আগুন হারামজাদা মাগী! এত শয়তানী! এত বেহায়াপনা! আমি হলুম না আপনার, হল কিনা এক ছোঁড়া! যা বেরিয়ে যা ওর সঙ্গে··· দূর হয়ে যা শীগগির···ইত্যাদি ইত্যাদি!

মেরেই ফেলেন আর কী! অসহ্য ঠেকলো মেঘেনের। এত

কুৎসিত, এত জঘন্য জানোয়ারও জগতে থাকতে পারে! কী পাপ! কী সে করেছে? মেঘেনের ইচ্ছা করলো, গিয়ে অক্ষয়বাবুর গলাটা টিপে দেয়। যাতে অমন কথা ও দ্বিতীয়বার উচ্চারণ না করে। কিন্তু তা সে পারলো না। যার বাড়ীর ঝগড়া তার বাড়ীতেই থাক, গায়ে টানবার কোনো প্রয়োজন নেই ভেবে সে একটা বই নিয়ে বসলো।

এর পর প্রায় দিন পাঁচ ছয় পরে এক দিন সকাল থেকে মেঘেন লক্ষ্য করলে, আজ অক্ষয়বাবু আর বুঁচকীর মধ্যে দারুণ এক বোঝা-পড়ার ঝড় চলেছে। অক্ষয়বাবু বুঁচকীকে কী একটা বিষয় নিয়ে রাজী করাতে চাইছেন, কিন্তু বুঁচকী মরিয়া হয়ে বলছে, না খবরদার! পারবো না আমি···আর অক্ষয়বাবু বলছেন, পারতেই হবে; তোর বাপ পারবে আর তুই তো দূরের কথা! স্বামী যদি চাস তো এ পরীক্ষা তোকে আমি করবোই।

পরের ব্যাপারটা কী হতে পারে তা ভেবে মেঘেন সুস্থির নয়।

তারপর অনেক রাত্রি···

ঘুমন্ত মেঘেন হঠাৎ জেগে উঠলো কী যেন ভারী এক ধাক্কা খেয়ে। চোখ চেয়ে দেখে চতুর্দিক অন্ধকার—আর সশব্দে কে যেন দরজাটা তার ভেজিয়ে দিয়ে দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে গেল। কে? দস্যু? গুণ্ডা? চোর? মেঘেন উঠে জেলে ফেললো আলো, আর আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখে বুঁচকী দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে! কী অভাবনীয় কাণ্ড! মেঘেন বুঝতে পারলো না—এটা একটা দুঃস্বপ্ন কিনা। তারপর খুব ভালো করে চেয়ে দেখলো, না, নিছক বাস্তব। এর মধ্যে এতটুকু কুয়াসা নেই, আছে এক জ্বলন্ত ষড়যন্ত্র!

মেঘেন তীব্রভাবে একবার চাইলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো: তোমায় কেউ এখানে দিয়ে গেল, না নিজে এসেছ? প্রশ্নটা সে

দুবার করলো, কিন্তু বুঁচকীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে, সে কথাই কইতে পাচ্চে না।

তারপর আস্তে আস্তে দেখা গেল, বুঁচকী অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বুকের ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করছে একখানা চিঠি, আর অলক্ষিতে ব্লাউজটার দুটো বোতাম খুলে……

হয়তো একখানা ছোরা বেরুলেও মেঘেন অত আশ্চর্য হত না, যতো হল সে চিঠিটার বেলায়। চিলের মত ছোঁ মেরে সে কেড়ে নিল সেই চিঠিটা, আর নিমেষে খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলো। তাতে লেখা আছে :

প্রিয় মেঘেনবাবু

আমার দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী পত্নীটিকে আপনার কাছে পাঠাচ্চি। কোথায় আপনার ব্যথা তা জানি, কাজেই উপশম করবার পথ নূতন করে বলে দেবার প্রয়োজন বোধ করি না। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। গোপনে রাখলেই ভালো হবে। আর বিশেষ প্রার্থনা, কাল সকালে যেন আমি কিছু টাকা পাই। অবশ্য বেশী চাই না। এই শ'খানেক দিলেই হবে। ইতি আপনার…

উঃ! তুবড়ী ফাটার মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল মেঘেনের মুখ দিয়ে। কী আশ্চর্য!· কী নিদারুণ! জগতে এমন স্বামীও কেউ আছে নাকি যে টাকার জন্য নিজের স্ত্রীকে অন্য লোকের হাতে তুলে দিতে পারে অম্লানবদনে! আর একী কুৎসিত অভিযোগ তার বিরুদ্ধে! কোথায় আপনার ব্যথা—এর মানে কী?

মেঘেন চুলগুলো হাতের চেটো দিয়ে একবার টিপে ধরলো—তারপর চিঠিখানা হঠাৎ বুঁচকীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল : তুমি জানো এটা কি লিখেছে?—দেখেছো? এর মানে কী? উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি কার হুকুমে এখানে

এসেছ? কী! উত্তর দাও শীগগির। বলেই কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে দৌড়ল দোতলায়। কিন্তু দোতলায় দৌড়ানই বৃথা! সমস্ত ঘর হাঁ হাঁ করছে, নেই সেখানে অক্ষয়বাবু। নীচে পর্যন্ত ছুটল মেঘেন—তারপর দরজা গোড়ায়। কিন্তু দরজা খোলা। বোঝা গেল অক্ষয়বাবু নিশ্চয় ভয়ে পালিয়েছেন রাস্তায় বা বাড়ীর আনাচে কানাচে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

ফিরে এল মেঘেন। মাথাটা তার এঞ্জিনের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। আর সর্ব শরীর যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

ফিরে এসেই কী ভাব গেল মেঘেন দরজাটা দিল বন্ধ করে। তারপরই বুঁচকীর একটা হাত দানবিক বিক্রমে সে টেনে ধরলো—আর দ্বিতীয় বারের জন্য চীৎকার করে উঠল—

উত্তর দাও! এর মানে কী…

ট্রিবিল টৌট্

কী করবে—কিছুই ভেবে পেল না অবনী। অনেকক্ষণ মেসের নীচেরতলার ড্যাম্প-ওঠা ঘরখানায় শুয়ে শুয়ে আর ছেঁড়া কম্বলটার ওপর এপাশ ওপাশ করে সত্যই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন কী যে সে করতে পারে তা যেন কল্পনাই করতে পাচ্চে না। মনের এমন এক অবস্থা সময়ে সময়ে আসে যখন মনে হয় কোন একটা অসুখ বিসুখ না করলেও যেন কোথায় একটা বড় অসুখ করেছে। শরীরের একটা বিশিষ্ট জায়গায় যেন সে বেদনার খোঁচাটা বার বার অনুভব করা যায়। ঠিক তাই! মেসে বাস করার আজ হচ্ছে শেষ দিন। মানে কারণটা এত বেশী পুরাতন আর পরিচিত হয়ে গেছে যে এর পর আর সেটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করলেও চলতে পারে।

দু' মাসের টাকাটার জন্য ম্যানেজার আজ যেভাবে তাকে অপমান করে গেছে তা অর্থহীন বলেই তার পক্ষে সেটা সহ্য করা সম্ভব হয়েছে। নচেৎ বোধ হয় অনেক আগেই একটা এর হেস্তনেস্ত হয়ে যেতো। যাক, আর ভাবতে পারে না সে। টাকা! টাকাটাই তো সব।

অবনী এক হেঁচ্কানী দিয়ে তার শরীরটাকে সোজা করে তুললো। এ কী! ঘড়িতে দশটা বাজে যে! কিন্তু আজ আর আশ্চর্য হবার

কিছু নেই। এখন দশটাই বা কী আর বারোটাই বা কী! বেকারের যে অখণ্ড অবসর!

অবনী জামাটা আস্তে আস্তে গায়ে গলিয়ে নিলে। কিন্তু বেরুতে যাবে কী—সামনেই চাকর দিয়ে গেল একখানা লেফাফা। হঠাৎ নিমেষের জন্ত অবনীর চোখ তুটো অকারণে যেন জ্বলে উঠলো, কিন্তু পর-মুহূর্তেই যেকে সেই! নেহাৎ একঘেয়ে আর পরিচিত সেই হস্তাক্ষর! লেফাফার ওপর টানা টানা অক্ষরে তার সেই নাম লেখা। অবনীর বুঝতে বাকী রইল না যে এ চিঠি কোথা থেকে আসছে। কাকা দিয়েছেন দেশ থেকে :—অবনী তোমার ওপরে আমরা অনেক আশা রাখি। তুমি তোমার মায়ের বড় ছেলে, সংসার এখন তোমারই বুঝে নেওয়া উচিত। কিন্তু দিন দিন তোমার এই অধঃপতন শুনে সত্যই আমরা তুঃখিত। তু'মাস আর একটীও পয়সা পাঠাচ্ছো না কেন, বুঝি না। তুমি পত্রপাঠ মাত্র উত্তর দেবে।

চিঠি পড়ে অবনী জোর হাস্‌লো আর মুখ দিয়ে একপ্রকার শব্দ করল : ফুঃ! আসল কথাই এই! ভাইপো তু'মাস পয়সা পাঠায় নি কাজেই তার অধঃপতন শুনে কাকাবাবু তুঃখিত! কাকাবাবু আশা রাখেন,...চমৎকার বাংলা দেশের কাকাবাবু! কিন্তু হায় কাকাবাবু! তুমি কী জান, অবনীর আর আশী টাকার মাইনের সেই চাকুরীটা নেই? তুমি কী জান—বড়বাবুর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজ অবনীর কী হাল হয়েছে!

অবনী মাথার রুক্ষ চুলগুলোয় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে তার-পরই পকেটে চিঠিখানা ফেলে দিয়ে মেস থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু এখন যায় কোথা? অবনী কোথা যাবে? এই মুহূর্তেই যে কিছু টাকার দরকার। হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই! কোন বন্ধুর কাছে যাবে অবনী? কোন বড়লোক বন্ধুর কাছে? কিন্তু না। বড়লোক

বন্ধুর কাছে যাওয়াই মিথ্যা! এখনো মনে আছে, প্রায় দিন পনেরো আগে এক বড়লোক বন্ধুর কাছে গিয়ে সে কী ঠকাই ঠকেছে! বন্ধুর নাম ছিল নলিনী। সোজা সে মুখের ওপর বললে, মদ খাওয়াতে পারি কিন্তু একটা পয়সাও ভিক্ষা দেব না।

অবনী বুঝিয়েছে—ভিক্ষা নয়, ধার, ধার..ধার দাও মাত্র কুড়ি টাকা।

কিন্তু তার উত্তরে সে বলেছে—ধারের জায়গা এখানে নয়, যাও কাবুলীর কাছে।

আর এক বড়লোক বন্ধু বলেছিল—যা অবনী! শিয়ালদা ষ্টেশনের ধারে একটা ব্লেড নিয়ে গিয়ে দাঁড়াগে যা। ভীড়ে টিড়ে সুবিধা হবে। তা, এ-শ্রেণীর বড়লোক বন্ধুদের কাছে সে যাবে ধার চাইতে?

অথচ গরীব বন্ধু—যারা সত্যই দিয়েছে অনেক সময়, তাদের কাছেই বা সে যায় কোন্ মুখ নিয়ে? শোধ করবার মত অবস্থা অন্ততঃ কিছু থাকা চাইতো!…অথচ টাকা! হ্যাঁ, টাকা আজ যে-কোনো প্রকারেই চাই যে। উঃ! কী করা যায়?

অবনী যতো ভাবে তত তার মাথা গুলিয়ে যায়। রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, এক রিক্সাওয়ালা ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করে', এ পর্যন্ত কত উপায় করেছে তাই গুণছে। অবনী স্থির হয়ে চেয়ে থাকে; তার সঙ্গে নিজের অবস্থাটা মিলিয়ে নেয়। ভাবে—আজ ওই রিক্সাওয়ালাটাও তার চেয়ে বড়লোক; তার চেয়ে উপার্জনশীল। অবশ্য উপার্জন করবার শ্রেণীবিভেদ না থাকলে সেও হয়ত রিক্সা টানবার চেষ্টা করত, কিন্তু ভদ্রলোক বলে যে কথাটা আছে, নিজেকে অভদ্র বানিয়েও তার সম্মান দিতে হবে যে!

অবনী ঢুকে পড়ে একটা গলিতে। সামনেই দেখে একটা মাড়োয়ারী তার গদিতে বসে বসে টাকার হিসাব করছে। এখানেও সেই হিসাব।

টাকা থাকলেই মানুষ হিসাব করে।

অবনীর আর কী ?

সে এবার আশ্রয় নিলে একটা পার্কে গিয়ে। বসলো ছায়ার মাঝে একটা বেঞ্চের ওপর। হঠাৎ মিনিট পাঁচেক পরে দেখা গেল অবনীর পাশে এসে বসেছে দু'জন ভদ্রলোক। দু'জনেই যেন কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনায় তন্ময়। তাদের টুকরো টুকরো যে দু' একটা কথা অবনীর কানে ভেসে আসে নি এমন নয়। কাজেই অবনীও কানটা একটু খাড়া করে রাখলে। কিন্তু মিনিট চারেক শুনেই অবনী মনে মনে একেবারে লাফিয়ে উঠলো। ওঃ! এত মজার জিনিষ থাকতে সে কিনা মেসের ম্যানেজারকে ভয় করে? এতক্ষণ টাকার জন্য ভেবে সে পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল! কী আশ্চর্য! রেস···রেস···রেসের কথা কে না শুনেছে? কে না জানে রেসে মানুষের দুঃখ ঘুচে যায়! কে না জানে এত অল্প টাকা নিয়ে এক গাড়ী টাকা আনা যায় ঘরে! কেন সে এতক্ষণ ভাবে নি তা? চিয়ার আপ্! আর ভয় নেই। অবনী ইচ্ছা করেই পাশের ভদ্রলোকের কাছে সরে এল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস্ করলে—আচ্ছা, বলতে পারেন কোন্ ঘোড়াটার চান্স বেশী ?

ভদ্রলোক বললে—সেইটেই তো ভাবছি, বোধ হয় লাকি গ্রার্ল-ই মারবে! বলেই তিনি ছোট একটা বই বার করলেন পকেট থেকে। রেসেই বই···

লাকি গ্রার্ল! লাকি গ্রার্ল! অবনীর দু'চোখ আনন্দে জ্বলে উঠল। নিমেষে সে কল্পনা করে ফেললো যেন সে রেসকোর্সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর সাগরের তরঙ্গের মত ছুটেছে ঘোড়া, ব্রুটাস, লাভলক, কিংমেকার, লেদারেট, হ্যাপি-ম্যান,···জকী, ভীড়, চীৎকার, কান্না, আনন্দ!

অবনী দাঁড়িয়ে উঠল। আর নয়,—যে কোনো প্রকারে তাকে

জোগাড় করতেই হবে উপস্থিত দশটা টাকা। মাত্র দশটা টাকা! যেখানে হাজার টাকা লাভ করবার সুযোগ আছে সেখানে এই সামান্ত পাথেয় কী? আজ যদি এই দশটা টাকা মাত্র—সে না জোগাড় করতে পারে তা হলে ধিক তার পুরুষ-জন্ম! কেন? অবনী কী এতই ফকির নাকি? আজ তার পয়সা না থাকতে পারে কিন্তু এখনো অবনীর বন্ধুরা কী ভুলে গেছে রাত্রির পর রাত্রি অবনী তাদের কী দারুণ আনন্দ দিয়েছে। তার জন্ম টাকা লাগে নি? চুলোয় যাক্ বন্ধুরা! হ্যাঁ, বন্ধুদের আশাই যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তা'হলেও কী আজ এই দুর্দিনে মাত্র দশটা টাকা সে, সসম্রমে পেতে পারে না কারো কাছ থেকে?

অবনী চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। ভাবল, হ্যাঁ, পারে। মাত্র একজন আছে, আছে নিশ্চয়—যে কখনই ফেরাবে না তাকে তার বাড়ী থেকে। সে শুধু একজন। হ্যাঁ, একজনই, যাকে সে মনের একেবারে নিবিড় গহন দেশে লুকিয়ে রেখে, কোনোদিনই নিজের কাছে পর্যন্ত ধরা দেওয়াতে চায় না। কারণ দুর্বল মুহূর্তে তাকে বাইরে এনে দেখলে নিশ্চয় তাকে সুলভ করে তোলা হবে। হয়তো শেষ সম্বল ঠাকুরের নাম করে তুলে রাখা ঠাকুরের পয়সাটাও খরচ হয়ে যাবার মত। কিন্তু আজ তাকেই দরকার। সবচেয়ে তার কাছ থেকে চেয়ে আরাম হল এই যে (অবশ্য অবনী তাই ভাবে) পয়সাটা শুধতে হবে না। অথচ অবনীর সৌভাগ্যের সে হিংসা তো করবেই না বরং আনন্দিতই হবে।

সে হচ্চে নমিতা। হ্যাঁ নমিতাই। অবনী তার প্রাইভেট টিউটার ছিল যখন নমিতা ইন্টারমিডিয়েট পড়ত। ওঃ! নমিতা তাকে কী ভালই না বাসতো! বাস্তবিক, অবনীর সে সব দিন যেন আকাশে হারিয়ে গেছে। আজ সেই নমিতার কাছেই অবনী··· যাকগে! সেজন্ম নমিতা কিছু মনে করবে নাকী? নমিতা সে

রকম মেয়েই নয়। বরং এখনো মনে আছে, নমিতা তার কানে কানে একদিন যে কথা বলেছিল।...

কিন্তু উপস্থিত কিছু প্রকৃতিস্থ হওয়া উচিত অবনীর। এ টাকা ও তো পাবেই। অবনী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল তারপরই পাড়ার চায়ের দোকানটায় ঢুকে আজও খেয়ে নিলে ধারে আধ কাপ চা।

তারপরই সে চলল কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে।

ওই রাস্তারই কোন একটা গলির মধ্যে নমিতাদের বাড়ী! বেশ বড়সড়ো দালানওলা বাড়ী। ...স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গেছে... হয়ত বাড়ীর পূর্বপুরুষরা এক সময় বড়লোক ছিলেন আজ মারা গেছেন বা টাকার টানা টানি।

নমিতার বাবা ডাক্তার। বেলা প্রায় দশটা বাজে। তা তিনি বোধ হয় এতক্ষণ 'কলে' বেরিয়েছেন। অবনী সেই সুযোগে চোরের মত ঢুকে পড়ল রোগীদের বিশ্রাম করবার ঘরে। বলা বাহুল্য, তখন রোগী কেউ ছিল না। তারপরই একবার গলার একপ্রকার শব্দ করল—অবনী। মানে, যদি কেউ কাছে পিটে থাকে তো আসবে।

তার মন তখন আশায়, উদ্বেগে কাঁপছে। বাস্তবিকই তো! আজ কতদিন পরে সে আসছে নমিতার কাছে। শুধু তাই নয়, আসছে অসহায় হেংলার মত টাকার জন্য, এখন এমন অবস্থায় নমিতা কী তাকে সুচক্ষে দেখবে? কিন্তু, কিন্তু ভাববার আর সময় নেই! সেই পূর্বেকার উড়ে চাকরটা যে সামনে এসে গেছে।

—কী রে জগন্নাথ! চিনতে পারিস্? অবনী সহসা একটা ঢোঁক গিললে।

আশ্চর্য—জগন্নাথ অনেকক্ষণ তার পানে তাকিয়ে থেকেও একটা কথা বললে না। তারপর সহসা সে তুবড়ীর মত ফেটে পড়ল

বিস্ময়ে—এ কী! মাষ্টার বাবু। —আপনি! আপনি সেই মাষ্টার বাবু! —একী চেহারা হয়ে গেছে আপনার?

অবনী তার ভাবপ্রবণতাকে বাধা দিলে। বল্লে,—যাক, চেহারা দেখতে হবে না! একটা কাজ কর তো জগন্নাথ, তোর দিদি মণিকে চুপি চুপি একবার ডাক তো। কাউকে জানাস নি যে আমি এসেছি।

জগন্নাথ যেন যেতে চায় না। বল্লে,· আপনার অসুখ করেছিল নাকী?

অবনী বিরক্তি প্রকাশ করে বল্লে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা শীগগীর, আমার বড় দরকার আছে—

—কিন্তু—

জগন্নাথ ফের কি বলতে যাচ্ছিল—অবনী তাকে তাড়িয়ে দিলে।

তার তিন মিনিট পরেই দেখলে স্বয়ং নমিতা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজা গোড়ায়। —এ কী সেই নমিতা?

অবনী দেখে সত্যই আশ্চর্য হল। তিন বছর আগের নমিতায়, আর আজকের নমিতায় মিল কোথা? কী দারুণ ও মোটা হয়ে উঠেছে বাস্তবিক। মেয়েছেলে মোটা হলে কী কদর্যই না দেখায়! কিন্তু রূপের বিচার আজ থাক। অবনী কথা কইবার জন্য সতর্ক হয়ে উঠল।

আর ইতিমধ্যে নমিতাই আগে কথা কয়ে ফেললে—একী? আপনি! —আপনি মাষ্টার মশায়, কিন্তু এ—

সহসা কি যেন বলতে গিয়ে নমিতার গলার আওয়াজ গেল বন্ধ হয়ে। আর সে খানিকটা অবাক হয়ে থেকে ভুরু কোঁচকালো —আরে রাম! রাম! কী চেহারা করেছেন আপনার?

কী আশ্চর্য! সকলেই চেহারা দেখে! চুলোয় যাক চেহারা—

অবনী কোন ভূমিকা না করেই বল্লে, যাক গে, শোন নমিতা, আমি আজ তোমার কাছে বিশেষ দরকারে এসেছি—

নমিতা একটা শ্লেষের হাসি হাসলো। —বল্লে, বিনা দরকারে কেউ কারো কাছে আসে না কী? তা কী দরকার শুনি?

—দরকার! —হ্যাঁ, দরকার, দেখ নমিতা, আমাকে দশ-পনেরোটা টাকা ধার দিতে পার? আচ্ছা দেখ, দশ টাকা হলেই চলবে—বেশী নয়, আমায় দিতেই হবে নমিতা—

অবনী সহসা যেন অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

আর নমিতা হাসলো। বল্লে, এতদিন পরে এলেন, কোথায় দু'টো কথা বলবেন···তা নয় তো প্রথমেই ধার—বলি, মদ বা নোংরামি তো ধরেছেন রীতিমতো শুনতে পাই। হঠাৎ নমিতার কণ্ঠে যেন বারুদ জ্বলে উঠলো, কিন্তু পকেটে এমন পয়সা থাকে না যাতে নিজের স্ফূর্তি নিজে চালাতে পারেন? ধার চান? কিসের ধার—! আমি এখানে ধার দেবার জন্ম বসে আছি নাকী? লজ্জা করে না একজন মাতাল হয়ে ভদ্রলোকের বাড়ী হঠাৎ ধার চাইতে আসেন? আপনার মাইনে-পত্র কিছু বাকী আছে এখানে, বলতে পারেন?

যেন সহসা একটা উড়ন্ত ঝড় বয়ে গেল। কী কথার কী জবাব—

এতগুলো কথা অনর্গল মুখস্থর মত যে নমিতা বলে যেতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি অবনী। আর ভাববে কী? যে নমিতাকে সে একদিন সবচেয়ে বড় দেবীর মত মনে করতো, সে নমিতা আজ এমনি হয়েছে? কী আশ্চর্য! এ কে! নমিতা! না অন্য কেউ? না তার প্রেতমূর্তি! আর একে মনে করেই অবনী আজ এসেছে বড় আশায়! হায় ভগবান!

এ সে করেছে কী? একটা বাজ পড়লে হয়তো অবনী তার শব্দকে সহ্য করতে পারত কিন্তু নমিতা—

এই উক্তির পর, হ্যাঁ—

—চুপ কর নমিতা। অবনী জোর আনলো গলায়; মদ বা নোংরামি

অনেক আগেই ধরেছি, সেজন্য ধার চাই না—জানতাম তুমি অনেক উদার, কাজেই অভাবে পড়ে মাত্র দশটা টাকা চাইতে এসেছি—রেস্ খেলব আর দেখবে, কী ভীষণ টাকার আমি হয়েছি মালিক। ভুলে গেছ নমিতা সেই কথা? তুমিই না একদিন আমার হাতে দিতে এসেছিলে দু'হাজার টাকা! বলেছিলে, চল, আমরা পালিয়ে যাব! আর আজ? দশটা টাকা চাইতে এসেছি বলে এমনি ইতরের মত গালাগালি দিচ্ছ?

—সাট্ আপ্! নিশ্চয়ই দেবো গালাগালি! নমিতা কথায় বিষ ঢেলে দিলো। —যে ভুল দুর্বল মুহূর্তে কোনো দিন করতে গেছ্লাম, তারি সুযোগ নিয়ে তুমি এসেছ টাকার দাবী করতে? আর আমি ধার দেবো জুয়াড়ীকে? রেস, জুয়া ছাড়া আর কী? ভবিষ্যতে যাতে না আসতে পার সে চেষ্টাও কচ্ছি। খবরদার! এই মুহূর্তেই বেরিয়ে যাবে কিনা শুনতে চাই।

সহসা নমিতা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে কে জানতো? আর অবনীর পক্ষেও এর পর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হল। বল্লে, অবশ্যই যাব; কিন্তু নমিতা—স্ত্রীলোকের পক্ষে এতখানি দাম্ভিকতা যথেষ্ট হয়েছে—আজ আমার শিক্ষা হল।

বলেই সে সোজা এল তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে। আর তার সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল—রাগে, দুঃখে আর লজ্জায়।

এর পর আর কোনো উপায়-ই নেই। অবনী বার বার এই কথা ভাবতে লাগল, আর আশা ভঙ্গ হলে মানুষের যা অবস্থা হয় ঠিক তারও তাই হল। কিন্তু নমিতাকে সে ক্ষমা করবে কী করে? মাত্র দশটা টাকা দিতে যে অমন অসভ্য আর মুখরা হয়ে ওঠে সত্যই অবনী তাকে এখনো মনে রাখবে নাকী? শুধু তাই নয়, অমন ভাবে যে বলতে পারে···মদ বা নোংরামি তো ধরেছেন রীতিমত শুনতে পাই—তার কাছে অবনী সহসা আজ এত খেলো হয়ে গেল?

তাহলে সেও দেখাবে অবনী সত্যই বাজে লোক নয়,—মাত্র টাকার গরম-ই কী সবের গরম? কিন্তু সেই টাকা—? ঘুরে ফিরে টাকার কথাই—

নাঃ! অবনী আর পারল না।

প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের ভেতর সে এসে কখন চলতে সুরু করেছে মনেই নেই। সহসা তার নাম ধরে পেছন থেকে কে ডাকল। বোধ হল মেয়েমানুষের গলা।

অবনী পিছন ফিরেই চিনতে পারল।—আরে খেঁদি যে! তুই এখানে?

—হ্যাঁ, আমরা উঠে এসেছি এ পাড়ায়। বলে খেঁদী নামক স্ত্রীলোকটী একটা বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

অবনী এই মুহূর্তে তাকে দেখে সত্যই খুসী হল। তারপর সে তাকে দেখে একটু দ্বিধাও করল; মনে ভাবল—হয়ত ইচ্ছা করলেও-ও তো দিতে পারে এখনি দশটা টাকা, তার রেস খেলার জন্য। কিন্তু দেবে কী? যে জায়গায় একটা ভদ্রঘরের মেয়ে তাকে দিল না একটা পয়সা, সে জায়গায় খেঁদী দেবে দশ টাকা! কেন, ও তো অনেক ঝানু নমিতার চেয়ে—যেহেতু অনেক ঘোড়ারোগে পাওয়া লোকই তো ও দেখেছে। তবুও চোখ-কান বুজে বলে ফেললে অবনী—এই খেঁদী! আমায় দশটা টাকা দিতে পারিস তুই?

—কেন গা? খেঁদী বল্লে।

—আমি রেস খেলব; সোজা উত্তর দিল অবনী। আমার মন বলছে হয়তো খুব বড়লোক হতে পারি—

খেঁদী গা ঝাড়া দিলে। বল্লে,—তুমি বড়লোক হলে আমার কী হবে শুনি?

—কী হলে খুশী হস বল দিকি—

খেঁদী বল্লে,—তোমার টাকার অর্ধেক অংশীদার হলে, আর তোমার মত বর পেলে—

—একী বলছিস তুই? অবনী রীতিমত অবাক হল তার কথায়। বল্লে, বরের সাধ এখনো মেটে নি?

—কী করে মিটবে বলো? ওটা কী মেটবার জিনিষ?

—তা হলে তুই এ পথে এসেছিস কেন? এখনো ভাল হয়ে যা না—

—সে উপায় আছে না কী? খেঁদী হেংলার মত চাইল।

—আচ্ছা ধর—অবনী বল্লে, আমি না হয় অনেক টাকা পেলাম, তারপর যদি তোকে বিয়ে করি, সত্যি খেঁদী ঠাট্টা কচ্ছি না, তা হলে তুই ভাল ভাবে আনন্দে থাকতে পারবি?

সত্যি আমায় তুমি বিয়ে করবে! খেঁদীর চোখদুটো হঠাৎ ঝক্‌মক্ করে উঠল—না হয় বিয়ে না কর, যদি তোমার বাড়ীতেই থাকতে দাও আর যদি খেতে দাও দু'বেলা তা হলে—

—না, তা হলে নয়। অবনী বাধা দিলে। বল্লে, বিয়েই তোকে আমি করব—কেন, হয়েছে কী? মানুষ জীবনে যদি একবার ভুল করে তা হলে তাকে আরো ভুলপথে ঠেলে দিয়ে মহত্ত্ব দেখাতে হবে! এমন মেরুদণ্ড চাই না। খেঁদী, সত্যি তোকে আমি বিয়ে করব, আর আমাদের সমাজ, এক নূতন দধিচীর বুকের হাড় দিয়ে তৈরী হয়ে উঠবে। খেঁদী! তুই শুধু দশ টাকা দিয়ে আজ সারাদিন ধরে ভগবানকে ডাক। যেন আমি অনেক টাকা জিত্‌তে পারি—

—কিন্তু, খেঁদী বল্লে, আমার কাছে তো নগদ দশ টাকা নেই। তুমি এই চুড়িটা বাঁধা দাও গে যাও, এ থেকে না হয় আরো পাঁচটা টাকা বেশী নেবে। ধর, পনেরো টাকা বেনের দোকানে চাইলে সহজেই দেবে। তাই নিয়ে যাও—

খেঁদী চুড়িটা হাত থেকে খুলে, দিয়ে দিলে অবনীকে। এই

হচ্ছে পতিতা নারী! অবনী খানিকটা স্তম্ভিত ও কৃতজ্ঞদৃষ্টি দিয়ে দেখলে খেঁদীকে ও আশ্চর্য হয়ে গেল তার মুখে এতটুকু ক্ষুণ্ণভাব না দেখে! গয়না খুলে দেওয়া যে মেয়েছেলের পক্ষে কতখানি কষ্টকর ব্যাপার তা একটু আধটু জানা আছে অবনীর। কিন্তু খেঁদী কি? নির্বোধ না বুদ্ধিমতী? না, মস্ত বড় আশার বশবর্তী হয়েই—

যাই হক, আর নমিতা? চূর্ণ হক নমিতা—অবনী সোজা এগিয়ে চলল।

* * *

এরপর প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে।

শুনলে আশ্চর্য হবেন, অবনী দারুণ জিতেছে রেসে। একেবারে অভাবনীয় ভাবে। যে অবনী একদিন রেসের 'র' পর্যন্ত জানতো না, সে খালি পনেরো টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে একেবারে চল্লিশ হাজার টাকা। পেয়েছে যাকে বলে—ট্রিবিল টোটে। শুধু তাই নয়, আরো সিঙ্গিল খেলেও কিছু মেরেছে। এ টাকা পাইয়ে দিলে তাকে কে? খেঁদীর প্রার্থনা!

সে নিজেই ভেবে অবাক হয়ে গেছে। অথচ এখনো মনে আছে—যখন সে ঘোড়া ধরেছে, জকিগুলো ছুটছে তীব্র বিদ্যুতের মত, দেখা যাচ্ছে বহুদূর থেকে তাদের লাল কালো টুপি, তখন কী দারুণ উত্তেজনাতেই না সে লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। এ খেলার সঙ্গে যেন মনে হয় তার বহুদিনের পরিচয় ছিল। কিন্তু তাই বলে অবনী অকৃতজ্ঞ নয়। সেই রাত্রেই সে সর্বপ্রথমে এসেছে খেঁদীর কাছে। তাকে কি অপার আনন্দ দিয়েই যে বার করে নিয়ে গেছে অন্ধকূপ থেকে···

বাস্তবিক, এই নরকে কেউ বাস করতে পারে নাকি? শুধু তাই নয়, তারপরদিন সে মেসের ম্যানেজারের মুখের ওপর কয়েকখানা

বৌটি কি চাদের মাথায় না ফেলে দিয়েছে। বলেছে, নিন, আরো দশ টাকা দিচ্ছি, যে ভাবে চেঁচামেচি করেছেন তাতে যথেষ্ট আপনার পরিশ্রম হয়েছে মনে হয়। এতে জল খাবেন—

আর তার কাকাবাবুকে? হ্যাঁ সে তো দিয়েছেই। শুধু তাই নয়; যেখানে যার যতটুকু ধার ছিল সবই সে শুধেছে। এখন একটা বাড়ী আর গাড়ীর দরকার। তা পাঁচ-ছ হাজারেই সে সহজে বালিগঞ্জের ওধারে কিনে ফেলেছে চমৎকার একটা বাড়ী। আর একটা গাড়ীও—

খেঁদী এখন পতিতা নয়। কে বলবে সে পতিতা? তাকে দেখতেও নেহাৎ এমন খারাপ নয়। অবনী তাকে যেভাবে রেখেছে তাতে অনেক স্ত্রীলোকই ওর ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষা করতে পারে। এখন অবনী ভাবে, মাত্র কয়দিন আগে টাকার অভাবে যে পৃথিবী ছিল তিক্ত, বিস্বাদ—টাকা পাওয়ায় সে কতটাই না সুন্দর হয়ে উঠেছে। আরো একটা কথা সে ভাবে। সে হচ্ছে নমিতার বিষয়। বাস্তবিক, এই সব মেয়ে কি নিয়েই বা গর্ব করে? কতটুকুই বা এদের পরমায়ু? যারা প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমেছে তারাই হল পতিতা, আর এই সব শিক্ষিতা মেয়ে বড় বড় সাবিত্রী! হায় সাবিত্রী! কিন্তু এখনো নমিতাকে যে সে ক্ষমা করতে পারে নি বা পারবে না তাও ভেবে দেখেছে। তার কথা মনে হলেই অবনীর কেমন সর্বশরীর জ্বালা করে। মনে হয় একটা মস্ত বড় আঘাত দেওয়া উচিত ওকে। আঘাত না দিলে যেন সত্যই মুক্তি নেই।

এর দিন পাঁচেক পরই যেন যোগাযোগ ঘটে।

সেদিন ছিল বোধহয় রবিবার। সময় সন্ধ্যা সাড়ে আটটা। মেট্রো থেকে সবে মাত্র বেরিয়েছে অবনী আর খেঁদী। দেখলে আজ কে ভাববে, দু'জনের জীবন ছিল পনেরো দিন আগে দু'রকমের? খেঁদীর পায়ে

হিল-উচু জুতা ; পরনে দামী সিল্কের শাড়ী, লোসান দিয়ে বাঁধা ঝকঝকে আধুনিক খোপা, ঝিকমিক কচ্ছে কানের বড় বড় কানবালা, সব চেয়ে মোহনীয় দুটি টানা-টানা চোখ। অবনীর তার চেয়ে সুন্দর সাজগোজ। জুতায় আটকে যাচ্ছে ধবধবে পরিষ্কার কাপড়ের বাড়ন্ত কোঁচা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, মাথায় সুগন্ধ তেলের গন্ধ, চোখে-মুখে বুদ্ধির তীব্র আভা।

অবনী সোনার সিগারেট কেশ থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠুকছিল, এমন সময়ে দেখলে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ক্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে নমিতা তারি দিকে। আশ্চর্য! নমিতা, নমিতাও এসেছে দেখছি—ও কে! ওঃ, উনি ডাক্তারবাবু, ওর বাবা। অবনীর মনে এবার সত্যই জাগল প্রতিহিংসা। বিশেষ করে নমিতাকে ইঙ্গিতে একেবারে তুচ্ছ করবার উদ্দেশ্যেই সে টেনে আনলো খেঁদীকে তার একান্ত পাশে। অতি কৃপার পাত্র হিসাবে নমিতার দিকে চেয়ে সে পাগলের মত হেসে উঠল—একটা ব্যঙ্গের হাসি। কী তীক্ষ্ণ, কী কঠোর! তখনো নমিতা বোধ হয় ওদের দিকে চেয়ে কি ভাবছিল। কিন্তু সে অবসরটুকুও কেড়ে নিয়ে অবনী এসে ঢুকে পড়লো মোটরে —সকলকে অবাক করে দিয়ে বেরিয়ে গেল হাওয়ার মত, ষ্টার্ট দিয়ে।

এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট হয়েছে, অবনী মনে ভেবে খুশী হল। এধারে বিস্ময়ে হতবাক নমিতা চিত্রার্পিতের মত চলতে লাগল, বাবার পিছন পিছন।

রূপান্তর

মধুপুরের অবারিত প্রান্তর জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। নিরালা তাঁবুর ভিতর একরাশ অস্বস্তি লইয়া বসিয়া আছি। সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হইল একটী যুবকের মূর্তি। পাতাঝরা এক বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া সে পড়িয়া আছে। দূর হইতে তাহাকে কি সুন্দরই না লাগিল!

কান্তিমান্ যুবক। সারা দেহ শুভ্র বেশ-ভূষায় ও চাঁদের আলোয় অপরূপ দেখাইতেছে। মাথার কেশ সম্ভবতঃ কুঞ্চিত।

ভৃত্যের সাহায্যে তাহাকে ডাকাইয়া আনিলাম।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সে আসিল।

চিনিতে তাহাকে কষ্ট হইল না।

একটী তরুণীর সহিত তাহাকে এ পথ দিয়া সান্ধ্য-ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি বহুদিন। অতএব সে আমাকে না চিনিলেও, আমি তাহাকে চিনিলাম।

তরুণী আজ সাথে নাই।

বসিতে বলিলাম।

আলাপ চলিল। অবশেষে অন্তরঙ্গতা...

যুবকের চোখে অসহায় অশ্রু...

মুখ বিষণ্ণ...

যুবক বলিল—আমি আত্মহত্যা করব···

বলিলাম—কেন ?

—জীবনে আর প্রয়োজন কি ? যাকে ভালবেসেছি—তাকে যদি না পাই, তা'হলে আর এর বেশী দুঃখ কি আছে জগতে ? এ দুঃখ নিয়ে বাঁচা আমার অসাধ্য !

বুঝিলাম—কোথায় তাহার বেদনা···

বলিলাম, তাকে যে পাবেন না, এ বিষয়ে কি নিশ্চিত হয়েছেন ?

—হ্যাঁ, নিশ্চিত হয়েছি বলে'ই তো আজ আত্মহত্যা কর্‌ব স্থির করেছি। তার বাবা পরিস্কার আমায় হাঁকিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমি বেঁচে থাক্‌তে ওর সঙ্গে তোমার···

বলিলাম—অপরাধ ?

যুবক কারণ যা' বলিল— মামুলী। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম।

···পৃথিবী ভারী দুঃখের···

নিজের-ই জীবনের কথা মনে আসিল। যাহাকে ভালবাসিয়াছি —তাহাকে পাই নাই। যাহাকে পাইয়াছি—তাহাকে ভালবাসি নাই। বাড়ীর পাঁচজনে আমার বিবাহের ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে—তাহা মরিয়া গেলেও ভুলিব না। এখন বুঝিয়াছি—যে যাহাকে চায়, তাহাকে না পাইলে জীবন তাহার সত্যাই হয় তো দুর্বহ হইয়া উঠে।

মাথায় আসিল খেয়াল।···

বলিলাম, ঠিকানাটা বলুন তো মেয়ের বাবার···

ঠিকানা সে বলিয়াছিল।

তারপর যাহা করিয়াছি···নিজেই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি নিজের সকল কৃতকর্ম দেখিয়া। সব কথা বলিব না। তবে এইটুকু জানিয়া রাখুন, যুবককে সে রাত্রে আত্মহত্যা করিতে দিই নাই। এমন কি বিবাহের কথা পর্যন্ত পাকা করিয়া ছাড়িয়াছি।

বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। সেইটুকুই কেবল দুর্ভাগ্য! কারণ সেইদিনেই কর্তার হুকুমে অন্যত্র তাঁবু ফেলিতে হইয়াছে।

তারপর জীবনের উপর দিয়া কতগুলি বছর-ই না চলিয়া গেল!

কত বসন্ত···কত বর্ষা! কত শরৎ···কত শীত!···কত ভাব··· কত ভাবনা!···কত মত···কত মতান্তর···

ভাগ্যের পরিহাস দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই।

পুনরায় সেই মধুপুরেই তাঁবু ফেলিতে হইল!···

আবার সেই অবারিত প্রান্তর জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। আবার সেই নিরালা তাঁবুর ভিতর একরাশ অস্বস্তি লইয়া বসিয়া আছি।

সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হইল একটি যুবকের মূর্তি।

আমারই তাঁবুর সাম্নে তাহার ছায়া আগাইয়া আসিতে লাগিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে যুবক অত্যন্ত দ্রুততার সহিত ছুটিয়া আসিয়া আমার-ই চেয়ারের হাতল চাপিয়া ধরিল!

যুবককে চিনিলাম।

কিন্তু ভাবিয়া অবাক্ হইলাম এ রুক্ষমূর্তি কেন তার?

যাহাকে একদিন ভৃত্যের সাহায্যে ডাকিয়া আনিতে হইয়াছিল এবং যে আসিয়াছিল অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত-ই আমার সম্মুখে, তাহার আজ আপনা হইতেই আসিবার কারণ কি?

যুবক দাঁড়াইয়া রহিল।

চোখে তার অসহায় অশ্রু।

মুখ বিষণ্ণ······

কিন্তু সহসাই সে রাগে ফাটিয়া পড়িল।

চেঁচাইয়া বলিল, চিন্‌তে পারেন?

—পারি।

যুবক বলিল, আমি আত্মহত্যা করব্‌…

বলিলাম—কেন ?

—কেন, জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ছেন ? জানেন না, কি ক্ষতি আমার হয়েছে ? যুবক জোরে জোরে বলিতে লাগিল—এ শত্রুতা আপনাকে কে কর্‌তে বলেছিল ? আমার জীবনের স্বপ্ন কেন আপনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ভেঙ্গে দিলেন ? কেন এর আগে আমাকে মর্‌তে দেন নি ? আজ আপনি কোন্‌ সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে বাঁচাবেন, বল্‌তে পারেন ?

বলিলাম—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না……

যুবক পাগলের মত কাঁদিয়া উঠিল।

বলিল, এ দুঃখ নিয়ে বাঁচা আমার অসাধ্য। যাকে ভালবেসেছিলাম কেন তাকে বিয়ে কর্‌তে হল ? কেন তাকে আমার সংসারের দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যে টেনে এনে তার এই বীভৎস রূপ দেখতে হচ্ছে ? এ দুঃখ নিয়ে বাঁচা আমার অসাধ্য !

ব্যাপারটা বুঝিলাম।

বলিলাম—এর জন্য কি আমি দায়ী ?

যুবক কান্নার মধ্য হইতে কি বলিল বুঝা গেল না।……কিন্তু সহসাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।…

দেখি, যুবক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে আর তাহার সম্মুখে একটী ছোট শিশি গড়াগড়ি যাইতেছে।

শিশির গায়ে লেখা—নাইট্রিক এসিড্‌। পয়জেন !

জয়পরাজয়

পাঁচজনে যেমন করে' প্রেমে পড়ে, পূর্ণেন্দুর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সবেমাত্র সে তখন ওকালতি পাশ করেছে, বেড়াতে যাচ্চে রোজ সন্ধ্যা হলেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের বাগানে। মনে তার কতো রঙিন কল্পনা, কতোই-না স্বপ্ন। কাজেই আশ্চর্য নয় তো এহেন যুবকের পক্ষে মেনকার মত বাইশ বৎসরের মেয়ের প্রেমে পড়ায়। আর মেনকাকে দেখতেও নেহাৎ খারাপ নয়। একেবারে যাকে বলে অতি-আধুনিকা…নব্যা। দিব্যি চালচলনে সে চটপটে, জর্জেট শাড়ীটী পরে' ঘুরে ঘুরে বেশ ছোকরাদের চোখে চটক্ আন্‌তে পারে, বুকের ব্লাউজের একটা ধার থেকে শাড়ীটার পাড়টা সরিয়ে কী চাতুরী-ই না খেলে! তার উপর মুখ-চোখে অদ্ভুত রকমের কী সুন্দর-ই না পেণ্টের ঘটা।

কাজেই পূর্ণেন্দু তো কোন্ ছার, কতো যুবক তার প্রেম প্রার্থনা করে!

কিন্তু না। একমাত্র পূর্ণেন্দুই ধরা দিল তার কাছে। দিল তাকে অবারিত ধন-দৌলত। ধন-দৌলত যার পিতার আছে কেন সে দেবে না তার প্রণয়িনীকে? আর ধন-দৌলত ছাড়া প্রেম-ই বা টেকে কোথা?

পূর্ণেন্দু তাকে নিয়ে গেল বাইস্কোপে। এমনি দিনের পর দিন। নিয়ে গেল সাহেব হোটেলে, গ্রেট ইস্টার্ণে।...নিয়ে গেল লেকে, আউট্রাম ঘাটে।...ফটো তোলালো একসংগে।...থেকে এলো কতো-দিন পুরীতে, ঘুরে এলো কতোদিন রাঁচিতে আর বন্ধু-বান্ধব মহলে কতো গর্বের সংগেই-না বান্ধবীকে দেখিয়ে বেড়ালো।

কিন্তু মুশ্‌কিল হল' বছরখানেক পরেই। অর্থাৎ যখন তার সহসা বিলাৎ যাবার সুযোগ এসেছে, আর প্রেমে পড়েছে ভাঁটা, তখন হঠাৎ একদিন মেনকা প্রস্তাব করে' বস্‌লো যে তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে।...এভাবে কতোদিন-ই বা চলা যায়? আর যতো শীঘ্র পারে পূর্ণেন্দু তাকে বিয়ে করে' তার অনূঢ়া নামের অবসান ঘটাক। কিন্তু তাতেই আকাশ ভেঙে পড়লো পূর্ণেন্দুর মাথায়।

বিয়ে?...অসম্ভব। তার সাম্‌নে এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিরাট পৃথিবী · মূল্যবান জীবন...

মূল্যবান জীবন হয়তো এই হিসাবে যে, এখনো মেয়ের বাপরা তাকে নিলামে চড়ায় নি। তা ছাড়া পূর্ণেন্দু আজকালকার সেরা সেরা সাহিত্যিকদের-ই লেখা পড়েছে।...এঁরা প্রত্যেকেই বিয়ের উপর চটা। তার উপর বিয়ের আগেই যখন তার বিয়ের সাধ মিটে গেছে তখন আর নূতন করে' এ প্রহসনের জের টানা কেন? সেইদিনই পূর্ণেন্দু চুটিয়ে একখানা চিঠি লিখলো মেনকাকে। রীতিমত উপদেশ দিয়ে, ঘৃণা দেখিয়ে চিঠি লিখলো ওই হেংলা মেয়েটিকে—

"অসম্ভব! তোমার প্রস্তাবকে আমি আমার সমস্ত পৌরুষ দিয়ে অগ্রাহ্য করি। এ-যুগে আমাদের জন্ম হচ্চে প্রেম করবার জন্য, বিবাহের জন্য নয়। তোমায় বিয়ে না করলে তোমার কী অবস্থা হবে সে-কথা ভেবে কষ্ট পাবার মতো ভাবপ্রবণতা আমার নেই। আমি তোমার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে' তোমাকে মুক্তি দিতে চাই।

এতেই আনন্দ। আরো জেনো, বিয়ের প্রস্তাব না করার কালে তোমার প্রতি আমার যে উচ্চ ধারণা ছিল, আজো আমি সেই উচ্চ ধারণা পোষণ করবার সুযোগ পেলে নিজেকে সুস্থ মনে করবো। মানুষ কখন বিয়ে করে জানো? যখন সে পরিশ্রান্ত হয়ে' পড়ে, যখন তার প্রেমের বহুমুখী প্রতিভা আর থাকে না। সেই কথাই অ'চিন্ত্য, প্রবোধ প্রভৃতি সাহিত্যিকরা বলে' গেছেন আমাদের শক্তিশালী বর্তমান সাহিত্যে। জানি, তুমি হয় তো ঠক্‌বে—কিন্তু উপায় নেই। ইতি…"

দু'দিন পরেই চিঠির উত্তর এল'। মেনকাও এতটুকু মচ্‌কায় নি। বরং বল্লমের মতো সোজা, ধারালো হয়েই লিখেছে:

"চমৎকার! এই না হ'লে আর শিক্ষিত ছেলে! প্রেমও করবো, একটী মেয়ের সর্বস্ব নেবো, অথচ বিয়ে করবো না, আর পাঁচটা পাঁচ রকমের পাঁচ জনের ধার করা চমকদার কথা বলে' নিজের পৌরুষ দেখাবো! ধিক! একে আবার পৌরুষ বলে কোথায়? পাছে তোমাদের মতো পাঁচটা জন্তুকে পেটে ধরতে হয়, এই ঘৃণাতেই তো ও-সব পাট উঠিয়ে দিয়েছি। তোমরা হচ্চো দুনিয়ার কীট। লজ্জা করে না, যাদের দায়িত্ব নেবার সাহস নেই, তাদের নিজেদের কাপুরুষতা লুকিয়ে একটা অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে? লজ্জা করে না, যাদের নিজেদেরই আত্মশক্তি এত মেরুদণ্ড-হীন তাদের অপরের আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে?… তোমার মধ্যে বীরত্ব কত্তোটুকু? সবটাই তো ভাবপ্রবণতা। আর তোমার উচ্চ ধারণারই বা ধার ধারে কে? সমাজে তোমার মতো সুবিধাবাদী অনেক লোকই তো দেখেছি—যারা পরের দোহাই দিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। তোমার সাহিত্যিকরা বিবাহের বিরোধী হলে'ও বোধ হয় অবিবাহিত নন, এই টুকুই মনে রেখো। আর ঠকার কথা তুলে যখন আনন্দ পেয়েছো তখন আরো দু'একটা

কথা বল্‌তে দাও। দুন্‌য়ায় কে জেতে আর কে ঠকে সেইটুকুই বিবেচ্য। ভেবেছিলে আমায় ঠকিয়ে ভারী আত্মপ্রসাদ লাভ করবে; কিন্তু সে গুড়ে বালি। আমি তোমাদের সমাজের কোনো কলেজে-পড়া আধুনিকা মেয়ে নই। তোমরা যাদেরকে লোকের সামনে বারবণিতা বলে নাক সিঁটকাও, আমি হচ্ছি তাদেরই একজন, যার ইহকাল-পরকাল ওই তথাকথিত আধুনিকাদের মতোই জটিল। সত্যি! ওদের সংগে আমাদের কতটুকুই বা তফাৎ তা তো বুঝতে পারি নে।···ইচ্ছে হলো—একদিন সাজগোজ করে বেরুলাম রাস্তায় শিকার পাকড়াবার ফন্দীতে আর তোমার মতো কতো ছেলেই যে পটে গেল!···এমন কি যারা পতিতালয়ে যেতে পর্যন্ত ভয় পায় সেই সব শ্রীপতিদেরও লুকিয়ে উপরি মার্‌বার চেষ্টা যে মনে কতোখানি হাস্য উদ্রেক করে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অথচ এরাই সমাজের শিরোমণি। এক বাড়ী থেকে যাকে সমাজচ্যুত করে' সমাজপতিরা লোকালয়ের বাইরে আন্‌ছে টেনে—তারাই যখন শকুনির মতো তার কাছে গিয়ে জড়ো হয় তখন আর ক্রোধ সামলানো অসহ্য।···সে-সব কথা যাক। পারো তো একদিন আমার চীৎপুরের বাসায় এসো, দেখে যেয়ো, তোমার মতো কতো বীরই প্রলাপ বক্‌ছে নেশার ঝোঁকে।

প্রেম করেছো, অথচ একদিনও জানো না আমি ছিলাম কে··· আমি ছিলাম কার উচ্ছিষ্ট! অবশ্য একদিন জানবেই। এক সংগে ফটো তুলিয়েছো; সে ফটোও যত্ন করে' রেখেছি। যদি কোনোদিন বড় হও তা হলে জন-সমাজে দেখাবো বলে। তারপর যদি বিয়ে নাই করো তাহলে' আমিও নিজেকে সুস্থ ভাববো। (এরপর দুন্‌য়ায় কে ঠকে আর কে জেতে সেইটুকুই বিবেচ্য···) ইতি···"

* * *

চিঠি পড়ে' পূর্ণেন্দুর যা অবস্থা হল' তা আর নাই বা বল্‌লাম!!

উপেক্ষিত প্লট

কাল ছিল শুক্রবার। অর্ধেক রাত ধরে' ভেবেছি একটা প্লট।···অতি মিষ্টি আর অতি অভিনব। জানি, এটা একটা গল্পে খাড়া করতে পারলে আর পায় কে? সামনেই পূজা। দিয়ে দেবো একটা কাগজের পূজাসংখ্যায় আর প্রশংসা পাব সম্পাদকের, পাঠকের, আর পাঠিকার। কিন্তু তার আগে আমার একটা অবশ্য করণীয় কাজ বাকী আছে। সেটা হচ্চে, কোনো প্লট ভেবেই আমি গল্প লিখতে বসি না। প্রথমে শোনাই সেটা বন্ধুদের বা কোনো সম্পাদককে বা, কাউকে একান্ত কাছে না পেলে আমাদের অফিসের মিঃ সাহাকে। তিনি নিজে সাহিত্যিক নন—কিন্তু সাহিত্য বোঝেন। ভদ্রলোক বাংলায় এম-এ। কাজেই তাঁর মতের একটা দাম আছে বৈ কি! ভাবলাম, এটাও শোনাতে হবে। এবং আজ শনিবার একপ্রকার প্রস্তুত হয়েই অফিসে ঢুকলাম। এবং এটাও ঠিক, তাঁর কাছ থেকে অনুমোদন পেলে কাল রবিবার সকালেই সুরু করে দেবো লিখতে!

কিন্তু বরাতটা এমনিই মন্দ যে সেদিন অফিসে গিয়ে দেখি তিনি অনুপস্থিত। কোথায় নাকি নিমন্ত্রণে গেছলেন তাই পেটের অসুখের জন্ত ছুটি নিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে বসে' আছেন।···আশা নিবলো।

শনিবারও খেটে খুটে বেরুলাম অফিস থেকে পাঁচটার সময়। ...ভয়ানক কাজ! তারপর আর প্লট শোনাবার চিন্তাকে স্থান দেওয়া যায় না মনে।

বাড়ী গিয়ে খাবার দাবার খেয়ে ফের তাজা হয়ে' উঠলাম। ভাবলাম, এইবার-ই প্রকৃত সময়। যাব বন্ধুবর অচিন্ত্যবাবুর বাড়ী। তারপর বল্‌বো এই প্লট; কিন্তু গিয়ে যা শুন্‌লাম তাতে রীতিমত বিরক্ত আর আশাহীন হয়েই দাঁড়ালাম। অচিন্ত্যবাবু নাকি বাড়ী থেকে রাগারাগি করে' চলে গেছেন। শুধু তাই নয়; তাঁর ভাই আমার ওপর একটা কাজ চাপাতে এলেন।

বল্লেন, যদি তাঁকে কোথাও দেখতে পান তো দয়া করে' পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন, তোমার জন্যে এখনো কেউ খাওয়া দাওয়া করে নি। সব কান্নাকাটি করছে। শীগ্‌গির বাড়ী যাও।

কথা শুনে আচমকা রেগে উঠ্‌লাম। বল্লাম, মাফ্‌ করবেন, আমার দ্বারা ও সব হবে না। আপনারা ভাইয়ে ভাইয়ে কী সব করে' বসে' আছেন আর সেই কথা আবার অপরকে শোনাতে আস্‌ছেন?—আর আমি মিথ্যা কথাই বা বলতে যাব কেন? আপনার চেহারা দেখে কোনো শিশুতেও বল্‌বে না যে আপনি এখনো না খেয়ে আছেন। আর কান্নাকাটি কোথায়?

বলে' না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলাম অচিন্ত্যবাবুর বাড়ীর গলি পার হয়ে'।

এবার কোথায় যাব? সত্যই ভাবনায় পড়লাম! আর তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে চল্‌লাম শশাঙ্কর বাড়ী। শশাঙ্ক হচ্ছে' আমার কলেজ জীবনের বিশিষ্ট বন্ধু। তারও মতকে মাঝে মাঝে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কাজেই তার বাড়ীতে গিয়ে কড়া নড়্‌লাম।

দেখি, মিনিট দুই পরে শশাঙ্ক ওপরের জানালা থেকে উঁকি মারছে।

বল্‌লাম, কী দেখছো ? নেমে এসো—

শশাঙ্কর মুখে কেমন একটা যন্ত্রণাসূচক চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো। বল্লে, পার্‌বো না।

—কেন পার্‌বে না ? আমি এতদূর থেকে আসতে পার্‌লাম তোমার কাছে আর তুমি এটুকু নেমে আসতে পার্‌বে না ?

শশাঙ্ক বল্লে, না, হাঁটুতে আমার ফোড়া হয়েছে !

মার্‌লাম নিজের কপালে একটা চড়। কী ভাগ্যই করেছি আজকের দিনটায়। যে শশাঙ্ককে বাড়ী থাক্‌তে বড় একটা দেখ্‌তেই পাই না সেই শশাঙ্ক যদিও আজ রইলো তো কিনা তার হাঁটুতে হল' ফোড়া !

ভাবলাম হাঁটুতে ফোড়া তো আমার প্লট শুনতে আপত্তি কী ? সে যদি নাই আস্‌তে পারে নিচে, আমি তো যেতে পারি ওপরে। বল্লাম, একটা গল্পের প্লট শোনাতে এসেছিলাম—

শশাঙ্কর মুখে আবার একটা কাতরতার চিহ্ন ফুটে উঠলো। বল্লে, না, আজ থাক। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি। কিছুই ভালো লাগছে না—

ভাবলাম, ফোড়া অনেকের-ই হয়, কিন্তু তাই বলে' সকলকেই যে অভদ্র হতে দেখেছি তা নয়। কিন্তু রীতিমত রাগ হল' আজ শশাঙ্কর ওপর। কারণ, নূতন করে' আজ যেন ভাবলাম শশাঙ্ক অভদ্র। এবং সেই মুহূর্তেই যে দিকে দু'চোখ গেল সেই দিকেই চলতে লাগ্‌লাম।

হুঁস হল' শিয়ালদায় এসে। হঠাৎ মনে পড়লো, তাই তো, এখানে তো শিবানন্দ ঘোষকে পাওয়া যেতে পারে। শিবানন্দ ঘোষ একজন বেশ ভাল সাহিত্যিক। চাকরী-বাকরী না করে সে এই-খানেই এক জায়গায় একটা মনোহারী দোকান খুলেছে। দোকানটী যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। যা চাইবে পাবে। কিন্তু দোকানে খদ্দেরের ভিড়ের কথা স্মরণ করে' আবার ভয় হল'। কিন্তু ভাবলাম, আজ

শনিবার। যা বেচাকেনা বিকাল বেলাতেই বোধহয় হয়েছে। এখন শিবানন্দকে একটু হয় তো নিরিবিলিতে পেতে পারি। সেই ভেবে গেলাম। এবং গ্যাঁট হয়ে বসলাম একটী টুলে। শিবানন্দ নিরিবিলিতেই ছিল। আমায় অভ্যর্থনা করে রাজী হল' প্লট শুন্‌তে। আর আমিও সুরু কর্‌লাম বল্‌তে। কিন্তু আগেই বলেছি, বরাত আজ খারাপ! কাজে কাজেই দেখি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এল প্রায় এক দঙ্গল খদ্দের। আর আধঘণ্টা ধরে' যেন উদ্‌ব্যস্ত করে' তুল্‌লো দোকানদারকে।

—হ্যাঁ মশাই, টর্চ আছে?

—আছে।

—দু' পয়সার 'র' নস্যি দিন তো…

—মাথার কাঁটা পাওয়া যায়?

—যায়।

—পানামা ব্লেডের দাম কতো?

—পাঁচ পয়সা!

—সে কী মশাই! সেদিন যে তিন পয়সায় কিনে নিয়ে গেলাম।

—তা হয় তো হবে! আজ দাম বেড়ে গেছে যুদ্ধের জন্যে।

—হ্যাঁ মশাই! এই হারিকেনগুলোর দাম কত?

—আচ্ছা বিয়ের উপহার দেবার জন্যে কাস্‌কেট পাওয়া যায়?

—যায়।

—দেখুন ছুঁচ আছে?

—আছে কিন্তু রাত্তিরে বিক্রী করি না।

ভাবলাম এই আপদগুলো জুটলো কোথা থেকে? এদের মেরে তাড়ানো উচিত। উঃ, আমার সব প্লো বুঝি গেল নষ্ট হয়ে! বল্‌লাম, উঠি…

শিবানন্দ বল্লে, সে কী হয়? প্লট না শুনে আমি ছাড়ছি না।

—কিন্তু প্লট বল্‌বো কোন ফাঁকে?

আবার নিরিবিলি পেলাম। আবার এল উৎসাহের বন্যা। কিন্তু যেই সুরু করেছি একটুখানি, ফের এল আপদ কোথা থেকে···

একটা পাওনাদার এসে টাকা চায়। তাকে দু'দিন ফেরানো হয়েছে উপরি উপরি। কাজেই শিবানন্দ বললে, বসো দিচ্চি···

তারপর আবার দশ মিনিট। আবার লোক···আবার খদ্দের··· আবার বেচাকেনা···আবার গোলমাল···

এত খদ্দের কোন্ চুলোয় ছিল? উঃ অসহ্য!

ঘড়ির দিকে চেয়ে মরিয়া হয়ে উঠলাম। দেখি নটা বেজে পাঁচ হয়েছে। ধৈর্য ছুট্‌লো! আর অনুরোধে গল্‌ছি না। অপমান! অপমান! ভাগ্য আমায় অপমান করেছে! রস বিতরণের বেলায় এ অপমানকে ক্ষমা করা যায় না। দাঁড়িয়ে উঠলাম। শিবানন্দ বসতে বল্‌ছিল কিন্তু আবার এক ডজন খদ্দের···এর পরেও আপনারা বস্‌তে বলেন? এসেছি সাতটায়। আর এখন হল' স-নটা। প্রায় এই দুঘণ্টা ধরে' টাগাফোয়ার খেলেছি। যে প্লট এতক্ষণেও বলা শেষ করতে পারি নি আর পেয়েছি চতুর্থ বারেও বাধা আবার তাই বল্‌বো? না, আর নয়।

একেবারে দোকান ত্যাগ করলাম। চলে এলাম বাড়ী। তারপর খেয়ে দেয়ে ব্যাস্—

বলা বাহুল্য, সে প্লট আর কাউকে বলি নি। তার গোড়ায় আছে নিশ্চয় অভিশাপ কারো।

আর, আরো একটা সত্যি কথা বলি, সে-প্লট নিয়ে কখনো আর জীবনে গল্প লিখি নি। কারণ নিজের মনে জেনে রেখেছি, সে প্লট অসমর্থিত, উপেক্ষিত!

রাত্রি শেষে

সন্ধ্যা হ'তে তখন একটু দেরী আছে।

গয়ার রামশিলা পাহাড়ের ওপর উঠে একটী যুবক মুগ্ধদৃষ্টিতে চারদিক দেখ্‌ছিল। অস্তগামী সূর্যটা তখন সুদূর দিগন্তে মেঘের কোলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সহরের ওপর বিছিয়ে পড়েছে একরাশ সোনালী আলো। দূরে শাদা বাড়ী এবং মন্দিরগুলো যেন কেমন একটা আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন রূপকথার ছোট একটা স্বর্ণ-পুরী। কে যেন চারধারে সোনা গালিয়ে পিচকারী দিচ্ছে। নীচে দিয়ে লোক হেঁটে যাচ্ছে। ওপর থেকে দেখাচ্ছে যেন 'লিলিপুটে'র ছোট ছোট মানুষ।

যুবক সমস্ত দেখ্‌ছিল। ঠিক্ এমনি সময়ে পিছন থেকে একটী অপূর্ব সুন্দরী তরুণী তার কাঁধে হাত দিয়ে ডাক্‌লে, তপেন!

তপেন যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এই রকম ভাব দেখিয়ে বিশেষ আশ্চর্যের সঙ্গে পিছন দিকে তাকালো। কিন্তু তাকিয়ে যা দেখলে, তা'তে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে সে দাড়িহীন অবস্থায় দেখলেও অমন হতো না।

অনেকক্ষণ পরে সে বিস্ময়ের সুরে তার দিকে তাকিয়ে বল্লে, তুমি! আরতি!

আরতি একটু হেসে বল্‌লে, হ্যাঁ, আমি, অত ভয় পাবার কারণ নেই। বাঘ বা ভালুক আমি নই।

তপেন বল্‌লে, সে আমি জানি, কিন্তু—

আরতি বল্‌লে, কিন্তু কি ? ভূত না পেত্নী—

তপেন একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে, না, সে আশঙ্কাও করি না ; কারণ, গয়াসুরের রাজত্বে ভূত-পেত্নীর থাক্‌বার মতো বিশেষ অনুকূল স্থান নেই। তবে—

তপেন কথা বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল। তার স্মরণে ভেসে উঠলো অতীতের একটা ছবি।

তখন সে পড়তো বি-এ। রোজ কলেজ যাবার সময় দেখা হতো ছাত্রী আরতির সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে ট্রামে-বাসে গিয়ে হলো ভাব। শেষে এমন অন্তরঙ্গতা উপস্থিত হলো যে, তপেনই আরতির দিত টিকিট কিনে। আরতি কত আপত্তি তুলতো—সে শুন্‌তো না। তপেন খাবার কিন্‌তো—আরতিকে খেতে হতো। শেষে দু'জনে দু'জনার বাড়ী পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি কর্‌তো। দু'জনে প্রতিজ্ঞা করতো—দু'জনকে বিয়ে কর্‌বে। ঠিক্ এমনি সময় হঠাৎ একদিন তপেন শুন্‌লে, আরতি পালিয়ে গেছে তার এক তরুণ মাষ্টারের সঙ্গে। কথাটায় তার মাথায় বজ্রাঘাত হলো।...মর্মে আঘাত লাগ্‌লো।...মন খারাপ হ'য়ে গেল। ...শেষে মা ছেলের ব্যাপার-ট্যাপার দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন জোর ক'রে এক শ্যামবর্ণ মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটীর সবই ভাল—কিন্তু তপেনের কাছে কিছুই তার ভাল লাগ্‌লো না। হঠাৎ একদিন সে বাড়ী ছেড়ে—

তপেন গম্ভীর হয়ে উঠলো।

আরতি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে, আমায় দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছ, নয় ?

তপেন কথাটায় যেন চম্‌কে উঠলো। তারপর নিজেকে বেশ হাল্কা করে নিয়ে বল্‌লে, আশ্চর্য, তা হয়েছি বই কি। ভাবছি, আগেকার আরতি কি এ সেই ?

আরতি হেসে বল্‌লে, যদি বলি সে মারা গেছে—যদি বলি, এ তার কঙ্কাল—তা' হ'লে বিশ্বাস করবে ?

তপেন বল্‌লে, আমি বাধ্য। কারণ তুমি হচ্ছো আমার গুরু—তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ! এক সময় আমি জান্‌তাম যাকে ভালবাসি, সেও আমায় ভালবাসে। কিন্তু আজ সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। এক গলা গঙ্গাজলেও দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি—নারীকে আমি ঘৃণা করি। তারপর একটু থেমে বল্‌লে, আমি মর্মাহত! তোমার মতো মেয়েও যে এ রকম কাজ করতে পারে, আমি তা' একদিন স্বপ্নেও ধারণা করতে পারি নি আরতি !

আরতি বল্‌লে, উপদেশটা না দিলেই ভাল করতে। মানুষ যা স্বপ্নেও ধারণা করতে পারে না, বাস্তবে তাই ঘটে।

তপেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে, বোধ হয় তাই।

তারপর একটু থেমে আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌লে, তুমি কোথায় আছ ?

আরতি বল্‌লে, বলার চেয়ে দেখানোই ভাল।

তপেন গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে, না, সেখানে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না।

আরতি বল্‌লে, তুমি ভুল বুঝ্‌ছো তপেন! এতখানি পাঁকে ডোববার আমার এখনো সাহস হয় নি।

তপেন বল্‌লে, ধন্যবাদ !

তারপর দু'জনেই খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ। তপেন বল্‌লে, তোমার স্বামী কোথায় ?

স্বামী! আরতি কেঁপে উঠ্‌লো। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌লে, অজয়বাবু দু'দিন হলো নিরুদ্দেশ. তার মোহ ভেঙে গেছে। বোধ হয় বুদ্ধদেবের আমল থেকে মায়াবাদটা চ'লে এসে এতদিনে পুরুষের সত্যি-ঘরের 'সোপেন হায়ার' ক'রে তুলতে পেরেছে।

তপেন বল্‌লে, 'বলাকা'র সার্থকতাই বোধ হয় ওইখানে।

আরতি বল্‌লে, হ্যাঁ, সার্থকতা নয়—সম্পূর্ণতা। তবে তোমার মতো কাউকে অকারণে ঘৃণা করবার সু-সাহস এখনো আমার হয় নি। আমি জানি—মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে তোলে।

তপেন কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। কোনো উত্তর দিতে পারলে না। তারপর বল্‌লে, তুমি কতদিন হলো গয়ায় এসেছো? কোথা' থেকে আস্‌ছো?

আরতি বল্‌লে, দু'দিন এসেছি। রাজপুতনা, উদয়পুর, যোধপুর বহুস্থান ঘুরে।

তারপর আবার দু'জনেই চুপ।

আরতি বল্‌লে, তুমি বিয়ে করেছ?

তপেন বল্‌লে, হ্যাঁ।

আরতি জিজ্ঞেস কর্‌লে, কতদিন হলো?

তপেন বল্‌লে, দেড় মাস—তুমি চলে আস্‌বার পর।

আরতি কটাক্ষ ক'রে বল্‌লে, তা' নতুন বিয়ে ক'রে যে গয়ায় এসেছ? তার পিণ্ডিটিণ্ডি দেবে নাকি?

রসিকতার কোনো উত্তর না দিয়ে তপেন বল্‌লে, বউ আমার পছন্দ হয় নি—তা' ছাড়া, গয়াতেই প্রথমে আসি নি, এসেছিলাম পাটনায়।

আরতি শুনে কোনো উত্তর দিলে না। আতঙ্কে তার বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

অনেকক্ষণ পরে আরতি একবার মিনতি করে বল্‌লে, আমার বাসায় যাবে?

তপেন এতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিল। কি ভেবে বল্‌লে, চলো।

তারপর দু'জনেই তারা রামশিলা পাহাড় থেকে নেমে এল। দক্ষিণ

দিকে যেতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ পরেই এসে পড়লো ষ্টেশনের কাছাকাছি। আরতি বললে, আর বেশী দূর নয়—কাছেই। ভাল কথা, তুমি এখানে কোথায় আছো?

—হোটেলে।

আরতি আর কথা কইলে না।

একটা বিস্তৃত গলির মধ্যে ঢুকতেই একটা ছোটখাটো বাড়ী দেখা গেল। আরতি তা'কে নিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলো। বল্লে, এস।—বলেই চাবি দিয়ে একটা তালা খুলে একখানা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালে। আলোটা জ্বাললে। তারপর একখানা চিঠি এনে তার সাম্‌নে ফেলে দিয়ে বল্লে, পড়ো।

তপেনের পড়্‌বার ইচ্ছা ছিল না। তবুও সে অনুরোধে পড়্‌লো।

অজয় লিখেছে :—

আরতি,

ভুল ক'রে তোমায় বাড়ী থেকে বার করে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম, তোমার কাছে ভালোবাসা পাব—নিবিড় ভালোবাসা,—কিন্তু তা' আমায় দিলে না। কত দেশ-বিদেশ ঘুর্‌লাম শুধু তোমার মনটাকে বদ্‌লে ফেল্‌বার জন্যে—কিন্তু তোমার মনটা যে পাষাণে গড়া, তাই এতটুকু নরম হলো না। শুধু দিনরাত তুমি তপেনের কথা ভেবেছো, আমায় ঘৃণা করেছো, এ যখন আমি বুঝ্‌লাম, তখন আর তোমাকে বশে আন্‌বার চেষ্টা আমি করতে পারি না—কারণ জোর ক'রে কাউকে বশে আনা যায় না। আমি চললাম, ফিরে চল্‌লাম।

হ্যাঁ, আর একটা কথা, তুমি আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পাবে না। তোমাকে আমি একলা ফেলে বিদেশ থেকে পালাচ্ছি না। তোমাকে

অনেক বলেছিলাম, বাড়ী রেখে আস্‌বো—চলো। কিন্তু তুমি বলেছিলে, সেখানকার দ্বার আমার জন্যে চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ। আমি যাব না। তাই তোমাকে ছেড়েই আমায় যেতে হচ্ছে।...কি কর্‌বো? তবে, হ্যাঁ, তপেনের সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তো আমি তা'কে তোমার গভীর ভালোবাসার কথা বল্‌বো।...তার কাছে ক্ষমা চাইবো।... তার কাছে প্রমাণ করে দেবো—তুমি পবিত্র। ইতি,

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

অজয়

চিঠিখানা পড়ে এক মুহূর্তের মধ্যে তপেনের মনের সমস্ত অভিমান দূর হয়ে গেল। অত্যন্ত অনুতপ্তের মতো ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে সে আরতির দিকে চেয়ে বল্লে, আমায় ক্ষমা কর আরতি। ভুল করে আমি তোমার প্রতি অবিচার কর্‌তে যাচ্ছিলাম।

আরতি হেসে বল্‌লে, মানুষ সাধারণতঃ ভুলই করে এবং অবিচার করা হচ্ছে তার মনের গতি—নচেৎ, আমিও ভুল ক'রে আমার বাড়ীর দ্বার নিজ হাতে রুদ্ধ করবার দুরভিসন্ধি কর্‌তাম না। একটু থেমে সে আবার বল্লে, যে মানুষ জীবনে ভুল না করে, সে মানুষ নয়।...ক্ষমাপ্রার্থীর কাছে ক্ষমা চাওয়া তার মিথ্যে।

তপেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে, যাক্, কখন সে চলে গেছে?

আরতি বল্লে, ভোরবেলা—অর্থাৎ, যে সময়ে বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষরা চলে গিয়েছিলেন।

তপেন হাস্‌লে। তারপর বল্লে, আমি শ্রদ্ধা করি অজয়কে তার চিঠি পড়ে।

আরতি এ কথায় কোনো কথা কইলে না। বল্লে, চা আন্‌ছি, বোসো।—বলে সে কক্ষান্তরে চলে গেল। তপেন বসে রইল।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট কাটলো, কিন্তু কোথায় চা ?

তপেন দাঁড়িয়ে উঠে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করবার জন্য যে ঘরে আরতি প্রবেশ করেছিলো, সেই ঘরে গেল। কিন্তু সেখানে যা' দেখ্‌লে তা'তে তার বিস্ময় বেড়ে উঠলো। চায়ের জলটা উনুনে ফুটে ফুটে মরে যাচ্ছে, আর তার পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আরতি।

তপেন বল্লে, কি হলো ? কি ভাব্‌ছো ?

আরতি বল্লে, চা নেই।

তপেন উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠ্‌লো, বল্‌তে হয় আমাকে! তোমায় দেখে আমার ভয় হয়ে গেছ্‌লো কিন্তু—বলেই সে জুতাটা পরে ফট্‌ফট্‌ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে নীচে নেমে গেল।

আরতি ছুটে এসে তার পিছনে গিয়ে বল্‌লে, শোনো, চা আনো, আর তোমার হোটেল থেকে ভাড়া-টাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাক্স-বিছানা-টিছানা এখানে নিয়ে এস। পাশের ঘরে তুমি থাক্‌বে—কোনো দ্বিধা করো না।

তপেন ফিরে বল্লে, কেন ? সে সব আবার—

আরতি হেসে বল্‌লে, তা' না হ'লে আমায় 'গার্ড' দেবে কে ? আমি একলা থাক্‌তে পারি বিদেশে ?

তা' ঠিক।—বলে তপেন একটু ভেবে চলে গেল।

খানিকটা পরেই সে একটা মুটে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলো। মুটের হাতে আছে বিছানা ও স্যুটকেস, আর তার হাতে আছে এক ঠোঙা খাবার, আর আধ পাউণ্ড চা ও চিনি। চা-টা নিয়েই আরতি অদৃশ্য হলো।

তপেন মুটেকে বিদায় দিয়ে একটা বেতের চেয়ারের ওপর ব'সে পড়লো।

একটু পরেই দু' কাপ চা তৈরী হয়ে গেল। তপেন খাবারটা দু' ভাগ ক'রে নিয়ে বললে, নাও ধরো। চা-টাও খাওয়া যাক্। আর শোনো, আজ আর রাত্রিতে রান্নাবান্নার হ্যাঙ্গাম ক'রে দরকার নেই। কিছু কচুরি, বরফী যা' খোট্টাদেশে মেলে, তাই এনে দু' জনে চালিয়ে দিই। গয়ার দইও সস্তা, সেও একসেরটাক্ আনি—

আরতি বললে, যা' ভাল বোঝো করো, আমার কাছে কিছু নেই।

তপেন বললে, সে আমি জানি, না বল্‌লেও চল্‌তো।

চা ও খাবার-দাবার খাবার পর তপেন প্রস্তাব করলে—চলো, বেড়িয়ে আসা যাক্—রাত্রিতে সহরে বেশ বেড়াতে লাগ্‌বে।

আরতি বল্‌লে, আমার আপত্তি নেই, তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে তোমায়, আমি কাপড়-টাপড় কেচে আসি।

তপেন বললে, বেশ এসো। তারপরই সে সুটকেস থেকে ডি, এইচ, লরেন্সের একখানা উপন্যাস বার ক'রে পড়ায় মন দিলে।

আরতি যখন গা-টা ধুয়ে এসে সাজসজ্জা ক'রে তপেনের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, তখন তপেন বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়ে গেল। তার রূপ দেখে মনে ভেসে উঠলো—কিছুদিনকার আগের স্মৃতি। হ্যাঁ, এ সেই আরতিই বটে! 'সাললতেব জঙ্গমা'—নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ একখানা সোনার পাত।

তারপর চল্‌লো বেড়ানো—রাত দশটা পর্যন্ত। তপেন যেন পূর্বের আরতিকে ফিরে পেয়েছে—এই ভেবে কত কথা, কত উচ্ছ্বাস সে ঢেলে দিতে লাগলো তার কানে। আরতিও তার যথাসাধ্য নারীর কোমলতা দিয়ে তৃপ্ত করলে তপেনকে।

রাত্রে বাসায় ফিরে কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর দু' জনেই শুয়ে পড়লো দুটো ঘরে।

সকালে উঠ্‌তেই তপেন যেন নতুন ক'রে গয়ার মুখ দেখ্‌লে।

শরতের সোনার আলোর অঞ্জলি চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে—গাছে গাছে—পথে পথে। হাওয়া বইছে—একটু শীতের আমেজ নিয়ে—বোধ হয় তার সঙ্গে শিশির কণার একটু স্নিগ্ধ স্পর্শ থেকে গেছে। তপেন নিজেকে বেশ হাল্কা ব'লে অনুভব করলে। পাশের ঘরে গেল। দেখ্‌লে, আরতি চা করছে। সে আর না দাঁড়িয়ে মুখ হাত পা ধুতে গেল।

চা খাওয়া হ'য়ে যেতেই তপেন বললে, চলো, ফল্গুতে স্নান ক'রে আসা যাক্। তার সঙ্গে বিষ্ণুর পাদপদ্ম দেখে আস্‌বো।

আরতি প্রস্তুত হয়েই ছিল। বল্‌লে, চলো।

দু' জনে বেরিয়ে পড়লো।

গয়াসুরের মন্দির দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। সূর্য-আলোয় তার মাথার সোণার পতাকা তখন ঝিক্‌মিক্ করে জ্বল্‌ছে। তপেন বল্‌লে, ওইটেই মন্দির।

আরতি বল্‌লে, হ্যাঁ।

দু' জনে তারা চল্‌তে লাগ্‌লো। সাম্‌নে পড়লো তাদের ছোটোখাটো গলি। দু'-তিনটে পুকুর। নীল জল।···আর একটা গলিতে গিয়ে তারা ঢুকলো। সেখানে রয়েছে কতকগুলো দোকান—পাথরের সামগ্রীর। কতকগুলো আবার কাপড়-গামছার।

তপেন বল্‌লে, একটা গামছা কিন্‌বো।

আরতি বল্‌লে, তোমার দরকার না কি ?

তপেন বল্‌লে, হ্যাঁ।—বলে একটা গামছার দর করলে। দোকানী বল্‌লে, দু' টাকা।

তপেন প্রথমটায় শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর বুঝ্‌লে—এদের ফন্দী। তীর্থ-যাত্রীদের ঠকাতে এরা একের নম্বরের ওস্তাদ! তাই

বললে, দেড় রুপেয়াকো এক পয়সা বি বেশী নেহি দেগা। খুসী পড়ে দোও।

দোকানী বল্‌লে, হামি এতো কোম দামে দিতে পার্‌বে না।

তপেন বললে, বেশ—বলেই খানিকটা এগিয়ে গেল। আবার পিছনে ডাকাডাকি। দু' টাকা থেকে নেমে এল শেষে দর কষাকষি ক'রে এক টাকা সাড়ে দশ আনায়।

তপেন গামছা কিন্‌লে।

তারপরেই এসে পড়লো দু' জনে মরুভূমির মতো বিস্তৃত ফল্গুতে। সেখানে হিন্দুস্থানীদেরই ভীড় বেশী। বাঙ্গালী ক' জন বুড়োবুড়ী ছাড়া আর ছেলেছোটকা কেউ নেই। লোকে স্নান কচ্ছে—পিণ্ড প্রদান কচ্ছে—দাড়ি কামাচ্ছে—মড়া পোড়াচ্ছে। চারধারে হৈহৈ! দু' জনে স্নান কর্‌তে নাম্‌লো।

স্নান হয়ে যেতেই এক পাণ্ডা এসে তাদের আক্রমণ করলে। বল্লে, চলো বাবুজী, হামি ঠাকুর দর্শন করিয়ে দেবে।

তপেন বল্লে, না থাক্ বাবা, আমরা নিজেরা যাচ্ছি।

পাণ্ডা নাছোড়বান্দা! বল্লে, খুসীসে যা' দেবেন, তাই লেবে। এতো এতো পয়সা হামি চাবো না।

অবশেষে পাণ্ডার কাছেই তাদের আত্মসমর্পণ করতে হলো। পাণ্ডা দু' জনকে গয়াসুরের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। জায়গাটা অন্ধকার। একটা বড় পাথর; তার ওপর একখানি পদ-চিহ্ন আঁকা। সেইটেই দেবতার পাদপদ্ম। পাণ্ডা মন্ত্র বল্লে। তপেন আর আরতি আবৃত্তি করলে। তারপর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং দক্ষিণা অন্তে তারা বেরিয়ে এল। পাণ্ডা তখনো ছাড়ে না। আরো ছোট ছোট দেব-দেবীর সিঁদুর মাখানো মূর্তির কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লে, দক্ষিণা দিন।

সেখানেও কিছু কিছু দিতে হলো।

অবশেষে পাণ্ডাকে মোটা দক্ষিণা দিয়ে এবং ভিখারীর দলকে কোনো রকমে সন্তুষ্ট ক'রে তারা রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লে। তারপর একায় চ'ড়ে—গেল দু'জনে বুদ্ধগয়া। সেখানে একটী ভাবোজ্জ্বল বুদ্ধমূর্তি বিরাজ করছে। সাম্‌নে একটী বড় প্রদীপ। শিখাটা দিপ্-দিপ্ ক'রে জ্বলছে। চারধারে বাগান। দুপুর-রোদে গাছগুলো ঝল্‌সে গেছে। মন্দিরটায়ও আছে অনেক শিল্প-কলা। সমস্ত দেখে-টেখে দু'জনে বাসায় ফিরে এল।

দিন চারেক কেটে গেল।

এখন অনেকটা তপেন ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লে আরতির তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। আরতি ঠিক সেই আরতিই আছে। তার মুখের হাসি, চলন-ভঙ্গী, কথাবার্তা তপেনকে বেশ তৃপ্তি দেয়। ···আরতি সাবান মাখে, চুল বাঁধে, নীল লাল কত রকমের শাড়ী বারান্দায় শুকোতে দেয়। তপেন ভাবে, এসব আরতির গৃহিণীপনার লক্ষণ। সে এক এক সময় সুখ-স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ওঠে। ভাবে, আরতি বুঝি তার শত জন্মের চেনা!·· আজ বিদেশের বান্ধবী হ'য়ে সে এসেছে। তাকে নিয়ে সে পেতেছে একটা ছোট-খাট সংসার—তার মাঝে আছে ছোট আশা—ছোট সুখ--ছোট কামনা। কিন্তু তখনি তার সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়—যখন সে দেখে, রাত্রি এসেছে। নির্মম রাত্রি! আরতিই তাকে পাশের ঘরে ঠেলে দেবে। সে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। ভাবে, কেন আরতির এই নিষ্ঠুর ব্যবহার!··· সে তো তাকে ভালোবাসে, তবুও কেন সুন্দর রাত্রিটাকে বৃথা যেতে দেয়! কাছে পেয়েও সে কেন তাকে নির্বাসন দেয়? শুধু যদি সে একই ঘরে—

আর ভাব্‌তে পারে না। মনটা তার ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রে ওঠে। উন্মনা হ'য়ে পড়ে।

সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি।···

খানিকটা জ্যোৎস্না এসে আরতির ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ একটা ফুলও ফুটেছে বাইরে। তার গন্ধ নিয়ে শরতের হাওয়া ভারাক্রান্ত।

তপেন আর পার্‌লে না। 'টপ্‌' ক'রে আরতির একখানা হাত চেপে ধ'রে ডাক্‌লে, আরতি!

আরতি যেন মুহূর্তের জন্য ভয় পেল। তারপর নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে বল্লে, বলো।

তপেন খুব ব্যথিতের স্বরে বল্‌লে, বল্‌বার আমার নেই কিছু আরতি। আমি জানি, আমার মনের ব্যথা বোঝ্‌বার তোমার ক্ষমতা আছে। তোমার যদি দেখা না পেতাম, তা' হ'লে বোধ হয় ভালোই থাক্‌তাম—কিন্তু তোমাকে কাছে পেয়ে আর আমি এ রকম দূরে দূরে নির্বাসিত থাক্‌তে পাচ্ছি না। আমি জান্‌তে চাই—তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে সমস্ত দিক্‌কার ব্যথা জুড়িয়ে দিতে পার্‌বে কি না! তুমি বলো, এখনো তুমি আমায় ভালোবাস?

আরতির মুখটা যেন সহসা মলিন হ'য়ে উঠ্‌লো। কি যেন একটা কথা বল্‌তে গিয়ে বল্‌তে পার্‌লে না। ঠোঁটটা তার কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো। স্তব্ধ পাষাণ মূর্তির মতো সে বসে রইলো।

তপেন আকুল হ'য়ে তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আরতির হাঁটুর ওপর পড়ে গিয়ে বল্লে, তুমি বলো, আমায় তুমি বিয়ে কর্‌বে!··· বলো, বলো, আরতি!···

তপেনের চোখে জল!

আরতি মিনিট চারেক পরে কথা কইলে—একটী ছোট্ট কথা। বল্লে, আমায় সময় দাও, আমি ভেবে কাল সকালে বল্‌বো।

তপেন ভারী গলায় বল্লে, বেশ, সময় দিচ্ছি। কিন্তু তুমি বিবেচনা

ক'রে দেখো—বিয়ে আমাদের দু'জনকারই মঙ্গল।—বলেই সে উঠে দাঁড়ালো এবং চোখের জল মুছে পাশের ঘরে গিয়ে বসে পড়্‌লো।

আরতির বুকে দারুণ ঝড়।···

সকালে একটা দুঃস্বপ্নে হঠাৎ তপেনের ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, আরতি! আরতি!

কিন্তু পাশের ঘর থেকে আরতির কোনোই সাড়া এল না।

তপেন বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল—মেঝের ওপর একটা লেফাফা।

অত্যন্ত কৌতূহল, আগ্রহ ও আশঙ্কার সঙ্গে সে সেখানি ছিঁড়ে ফেলে চিঠিখানা বার করে পড়্‌তে লাগ্‌লো। আরতি লিখ্‌ছে—

প্রিয়তম!

আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লাম, তোমাকে বিয়ে করা আর আমার এ জন্মে যায় না—কারণ, আমি এখন সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত!

আমি জান্‌তাম, তুমি মহৎ—তুমি এ-প্রস্তাব আমার কাছে একদিন কর্‌বেই—অবশ্য আমাকে বাঁচাবার জন্যেই—কিন্তু তারও আগে যে আমি মারা গেছি, এ তো তুমি জানো না!···

তুমি জান্‌বেই বা কি ক'রে? তোমার মন যে সরল—তাই তুমি অজয়বাবুর চিঠি পড়েই সব বিশ্বাস কর্‌লে। কিন্তু তরুণ এবং তরুণীর 'সাইকলজি' যারা ভাল ক'রে পড়েছে, তারা এ কথা কখনই বিশ্বাস কর্‌বে না যে, দেড় মাস ধ'রে যারা দু'জনে কত দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছে, তারা ভালো থাক্‌তে পারে। অন্ততঃ চেষ্টা করেও আমি ভালো থাক্‌তে পারি নি। কোনো দুর্বল মুহূর্তে···যাক্, বেশী বল্‌বো না। তবে এইটুকু বলি, অজয়বাবু আমায় তার ভাবী সন্তানের মাতৃত্বের আসনে বসিয়ে গেছে। আর একটা কথা। ও

যা' চিঠি লিখেছিলো এবং যেটা আমি তোমায় দেখিয়েছিলাম, তার অর্ধেক কথা মিথ্যে। ও একরকম আমার স্বামী হলেও আমি ওর মিথ্যাবাদিতা এবং কাপুরুষতার জন্যে ওকে ঘৃণা করি। আর একটি কথা, ও কেন পালিয়ে গেল এবং আমি কেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম সেটা কিন্তু তোমার কাছে আমি গোপন করলাম। তার জন্যে রাগ করো না প্রিয়তম!

তোমায় যে আমি কত ভালোবাসি, তা' এই সামান্য চিঠিতে লিখতে পারব না। যেদিন অজয়বাবু এখান থেকে চ'লে গেলেন, সেদিন খুঁজেছিলাম আমি তোমাকেই গয়ার পল্লীতে পল্লীতে—পাহাড়ে পাহাড়ে—রাস্তায় রাস্তায়। কারণ, আমি ইতিপূর্বে তোমায় দেখেছিলাম একদিন। তারপর, তোমায় যখন আমি কাছে পেলাম, তখন যে আমার কী আনন্দ তা' আমি কেমন ক'রে বলবো! শুধু দু'দিন তোমার সঙ্গসুখ অনুভব করবার জন্যে তোমাকে ঘরে এনে রাখলাম। বাজে চিঠিখানা পড়তে দিয়ে তোমার মন হাল্কা করলাম। তোমারি অন্নে ক'টা দিন শরীর ধারণ করলাম—কিন্তু তুমি যা' চাইলে তা' যে আমি দিতে পারলাম না! কেমন ক'রে দেবো? বাসি ফুলে যে দেবতার পূজা করতে নেই।

শেষ কথা আর একটা আছে, শোনো। তোমার ব্যাগ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আমি এ স্থান ত্যাগ কচ্ছি। আজ রাত্রেই কাশী চলে যাচ্ছি। জীবনে আর অসৎভাবে কোনো কাজ করবো না। আই-এ পাশ করেছি। সেই বিদ্যা নিয়েই কাশীর একটা মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পদ পেয়েছি। তাই করেই কোনো রকমে থাকবো। তোমার টাকা ফেরৎ দেবো।

আর শেষের আমার আর একটা অনুরোধ—তুমি ফিরে যাও প্রিয়তম, ফিরে যাও তপেন, বাড়ী ফিরে যাও! তুমি বিবাহিত—তুমি

শিক্ষিত। সেখানে আর তোমার গৃহলক্ষ্মীকে কষ্ট দিয়ো না। তার মধ্যেই তুমি আমার মূর্তি দেখ্‌তে পাবে—একটু চেষ্টা কোরো।...ইতি,

আরতি

চিঠিখানা পড়ে তপেনের চোখের সামনে জগৎ অন্ধকার করে এল। সে দাঁড়িয়ে মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে বিছানার ওপর প'ড়ে গেল।

বিপ্লবের বিয়ে

এই নিয়ে পর পর তিনবার হলো।

তিনবারই তাকে দেখ্‌তে এসেছে, আর তিনবারই বিদ্রোহ করেছে বিপ্লব।

প্রথমবারে এলেন এক বৃদ্ধ। সংগে তাঁর একটি ছোট ছেলে। একদিন রাত্রিতে এসে ধর্‌লেন তিনি বিপ্লবের বাবাকে। বিপ্লবের বাবা—গভর্ণমেণ্টের বড় উকিল ত্রিলোকনাথবাবু তখন মক্কেলদের সংগে কথাবার্তা কইছেন বৈঠকখানায় বসে।

…বৃদ্ধ একরকম কেঁদে পড়লেন। বল্‌লেন—তিনি আসছেন ত্রিলোকনাথবাবুর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে না কি।…কন্যাদায়! এ যাত্রায় তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। পয়সাকড়ি যৎসামান্য খরচ করতে রাজী আছেন।…মেয়েরও বয়স বেশী নয়…পড়েছে সবে চোদ্দয়। সংসারের কাযকর্মে পরিপক্ক।…গৃহস্থের ঘরের মেয়ে। এখন একমাত্র ত্রিলোকনাথবাবুর হাত…

ত্রিলোকনাথবাবু অভয় দিলেন। বল্‌লেন—বেশ তো! এ পর্যন্ত আমার ছেলের তো সম্বন্ধ আসে নি। কাযেই তার বিয়ের চেষ্টাও করি নি। তা'…ছেলেকে যদি পছন্দ হয়…

—পছন্দ হয় কি মশায়! বৃদ্ধ গলে' পড়্‌লেন। বল্‌লেন—বাঙালীর

ছেলে···লেখাপড়া শিখেছে···রূপে কার্তিক···চাকরী করে···কাণা নয়, খোঁড়া নয়···পছন্দর কথা আবার কি! শুভস্য শীঘ্রং ··

হ্যাঁ, শীঘ্রই হল' বটে, তবে মেয়ের বাপের পক্ষে শুভ নয়—অশুভ।

যখন বিপ্লব একদিন দেখ্‌লে—মেয়ের বাপটী বড় বাড়াবাড়ি করে তুলছেন, তখনই সে তার বন্ধুবরটীকে পাঠালো।

বন্ধুবরের নাম হচ্ছে—গোকুল। পাড়ার ডাকসাইটে ছেলে। গোকুল গেলো ভিজে বেড়ালটীর মতো, আর এমন সব কথা মেয়ের বাপের কাছে বলে' এলো, যারপর কোনো বাপই আর এগুতে সাহস করেন না, যদি অবশ্য তিনি তাঁর মেয়ের মংগল চান।

গোকুল বল্‌লে—আরে ছোঃ! ওই ছেলের সংগে বিয়ে দেবেন? ও যে মশায় মদ খায়, ওর যে গায়ে সেবার কি ঘা হয়েছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি···

প্রথম ফাঁড়া তার কাট্‌লো। এবার এলো দ্বিতীয়।

বিপ্লব একদিন অফিস থেকে এসে শুন্‌লো তার নাকি বিয়ে হবে। এক ভদ্রলোক দেখ্‌তে এসেছিলেন। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের ওইখানে কোথায় থাকেন। তা' ছেলেকে না পেয়ে ছেলের একখানি ফটো নিয়ে গেছেন ত্রিলোকনাথবাবুর কাছ থেকে। আর ছেলে যে একজন বড়দরের গল্পলেখক, এটুকুরও পরিচয় পেয়ে গেছেন তার সব কাগজ-পত্র ঘাঁটুকে।

বিপ্লব উঠলো রেগে। প্রথমেই গেল ত্রিলোকনাথবাবুর কাছে। বল্‌লে—আমার বিয়ের জন্য আপনি এতো উতলা হ'য়ে উঠেছেন কেন?

ত্রিলোকনাথবাবু বক্রদৃষ্টিতে একবার তাঁর পুত্রের দিকে চাইলেন। নূতন করে' তিনি যেন আজ তার পরিচয় পেলেন। খানিক ভেবে বল্‌লেন—ছেলে বড় হলে' বাপ-মা সাধারণতঃ উতলা হয়েই থাকে···

—কিন্তু আপনি ভুল করছেন—ছেলে বড় হলে' নয়, মেয়ে বড় হলে'।···আর মিছে আমার বিয়ের কথায় থেকে আপনি সময় নষ্ট করেন—সেটা আমার ইচ্ছা নয়···

বিপ্লব চলে' যাচ্ছিল। বাবা তাকে ডাকলেন। বল্লেন—শোনো, যাতে আমার অপমান না হয় সেটাও তোমার করা কর্তব্য, আশা করি তুমি বুঝ্বে···

—নিশ্চয় বুঝ্বো। কিন্তু অপমানটাকে অত সামান্য কারণে প্রাধান্যও দিতে চাই নে। আপনার মেয়ে থাক্‌লে আপনাকেও ছেলের বাড়ী যেতে হতো, কিন্তু ছেলের বাবা ফিরিয়ে দিলেই বুঝ্তেন অপমানটা সে জায়গায় অত বেশী কার্যকরী নয়।

এই হল' পিতাপুত্রে আলাপ···

তার পরদিনেরই ঘটনা।···বিপ্লব বাড়ীতে থাক্‌তে থাক্‌তেই সেই ভদ্রলোকটী দেখ্তে এলেন। বিপ্লব গেল; কিন্তু বরবেশে নয়, বিদ্রোহী হ'য়ে। গিয়েই প্রথমে সুরু করলে—কাল যে ফটোটা নিয়ে গেছেন, সেটা ফিরিয়ে এনেছেন কি ?

ভদ্রলোক শুনে তো হকচকিয়ে গেলেন। বল্লেন—না, সেটা চাই না কি ?

—অবশ্যই চাই, আর মনে হয় আমারই সংগে বোধ হয় বিয়ের সম্বন্ধ কর্'তে এসেছেন ?

ভদ্রলোক অস্বীকার করলেন না।

বিপ্লব বল্লে—আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্চি। এরপরও আপনি বিয়ে দেবেন কি ?

কি জানি কি হ'ল—ভদ্রলোক বোধ হয় রেগে উঠ্লেন। বল্লেন —হ্যাঁ দেবো···ঘরজামাইও তো লোকে রাখে !

—বটে ! মেয়ে আপনার কতদূর লেখাপড়া শিখেছে বলুন তো ?

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া আমাদের বংশের রীতি-বিরুদ্ধ।—ভদ্রলোক ক্ষেপ্পা হয়ে' উঠ্‌লেন।

তা' হলে শুনুন—সে রীতি ভেঙে দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত পিতা-মাতারই কর্তব্য। আর তেমন বউ আমি কর্‌তে চাই নে—যে আমার অবর্তমানে অন্ততঃ একটা মেয়ে স্কুলের মাষ্টারী পর্যন্ত ক'রে জীবিকা অর্জন কর্‌তে অসমর্থ!

বিপ্লব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আর লজ্জায় অপমানে জর্জরিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ত্রিলোকনাথবাবু, তাঁর ভায়েরা।

অবশ্য বিয়ে তো হলোই না বরং বিয়ের কথায় যে আর ত্রিলোকনাথ-বাবু কখনোই থাক্‌বেন না, সেইদিনই সেই প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন।

গেলো দ্বিতীয় দফা। এবার এলো তৃতীয়।

বাড়ীশুদ্ধ যখন সবাই বিরক্ত, আর বাড়ীর সেই খুদে ছেলেটা পর্যন্ত যখন বিপ্লবের উপর অসন্তুষ্ট, তখন এলেন পাড়ার একটি ভদ্রলোক। ফের সেই বিপ্লবের বাবার কাছেই। বল্‌লেন—ছেলেটিকে বড় পছন্দ হয়েছে। দিন না বিয়ে।

কিন্তু নেড়া বেলতলায় যায় একবারই। ত্রিলোকনাথবাবু আর গল্‌লেন না। পরিষ্কার বল্‌লেন—ও আমার দ্বারা হবে না মশায়··· ছেলে বেয়াড়া···আমার কথা শোনে না। আপনি যদি নিজে থেকে রাজী করাতে পারেন তো চেষ্টা করে' দেখুন।

ভদ্রলোক চেষ্টা করেছিলেন। বিপ্লবকে ব্যাপারটা না জানিয়ে নিয়ে গেছলেন তাঁর বাড়ীতে, আর তাঁর ভাইঝিকেও ডেকেছিলেন—জয়শ্রী, এ ঘরে এসো তো···চা-টা দিয়ে যাও···

কিন্তু দু'চারদিন পরেই যখন বিপ্লব জান্‌লো—এই জয়শ্রী-ঘটিত ব্যাপারটা বিশেষ ভালো নয়, তখন সে আর সুচক্ষে দেখ্‌লো না ভদ্রলোককে।

—এ রকম কতদিন থেকে সুরু করেছেন ?···যাক্, ভবিষ্যতে সাবধান হবার চেষ্টা কর্‌বেন।—ব'লে বেরিয়ে এসে'ছিলো।

এই গেল এক এক ক'রে তাকে দেখ্‌বার তিনবারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

কিন্তু এই তিনবারের বেলাতেই শেষ হলো না। এবারও এলো। সেটা হচ্ছে চতুর্থ, আর চতুর্থ-ই চরম!

রবিবার দেখে একদিন এলেন বিপ্লবের অফিসের বড়বাবু—লাঠিটা ঠক্‌ঠক্ কর্‌তে কর্‌তে। বিপ্লবের বাবা অভ্যর্থনা কর্‌লেন। আর বড়বাবু যে প্রার্থনাটী করে' বস্‌লেন তা' ত্রিলোকনাথবাবুর প্রতিজ্ঞা রক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তিনি পার্‌লেন না—না বল্‌তে। বরং বল্‌লেন—আজকালকার ছেলে আমাদের কথা শোনে না মশায়। ইতিপূর্বে তিনটী সম্বন্ধ এসেছিল, আর তিনটেই···সে জন্য ভয় আছে পাছে আবার বেয়াড়া রকমের কিছু করে' বসে···

বড়বাবু শুনে বল্‌লেন—সে ভার আমার। ও সব ছেলেকে টিট্ কর্‌তে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগে না।···বিয়ে করবে না? ওস্তাদি!

প্রায় এক রকম পাকাপাকিই কথা হয়ে গেল সে'দিন। মেয়ে কি রকম, কালো না ফর্সা—এ সব প্রশ্ন বড় আমল পেলো না—যেহেতু বড়বাবুর মেয়ে! যেমন-ই হোক্ না, বিয়ে কর্‌লেই কাল বাদে পরশু বিপ্লবের একশো পঞ্চাশ টাকা মাইনে থামায় কে?

কিন্তু এ বিয়েতেও, শুন্‌লে অবাক হবেন—বিপ্লব রাজী হলো না। বাবাকে পরিষ্কার বল্‌লে—ছেলের যে মতের একটা মূল্য আছে—এটুকু ভেবে দেখা আপনার উচিত ছিল।

হঠাৎ ছিট্‌কে বেরিয়ে এলেন সেজকাকা ঘর থেকে। বল্‌লেন—না, কিছু উচিত ছিলো না। এবারের বেলায়ও যদি তুমি আমাদের

অপমান করো, তা' হলে' এখনি বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যাও। আমরা চাই নে তোমার মুখদর্শন কর্‌তে।

মেজকাকা সাম্‌নে এসে বল্‌লেন,—তুমি একটি গর্দভ! বড়বাবু যেচে এসেছেন বিয়ে দিতে, আর নিজের পায়ে নিজেই তুমি কি না কুড়ুল মার্‌ছো! আজ চাকরী গেলে যে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে।···

কারো কোনো কথার জবাব দেওয়া এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিপ্লবও বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে, আর রইলো একটা বন্ধুর মেসে।··· অফিসও সে যায় নি—যে হেতু বনে বাঘ, জলে কুমীর। দু'দিকেই বিপদ!

কিন্তু দিনতিনেক পরে সেজকাকা আবার তাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেলেন। বল্‌লেন—বিয়ে কর্‌তে হবে না, চলো, বড়বাবু অন্যত্র সম্বন্ধ করেছেন···

বিপ্লব বাড়ীতে গেল। আর যেই ঢুক্‌লো ঘরে, অমনি দরজায় তালা লাগিয়ে তাকে আবদ্ধ করা হল'।···সে হল' বন্দী। সেজকাকা নিজের তারিফ্ করতে লাগ্‌লেন—কেমন, বুদ্ধিটা ঘটে কিছু কম আছে কি আমার! হেঃ হেঃ হেঃ!

তারপরই বল্‌লেন—জোর কর্‌বো—জোর করিয়ে তোমার বিয়ে দেওয়াবো। একটা অত বড় লোকের সাম্‌নে তুমি আমাদের অপমান কর্‌বে?

বিপ্লবও হাস্‌লো মনে মনে। ঠাট্টা কর্‌লো কাকাকে। বল্‌লে—বাস্তবিক, আপনাকে একটা ভালো জিনিষ উপহার দেওয়া উচিত কিন্তু! না জানি এ বুদ্ধি নিয়ে যদি স্বাধীন দেশে জন্মাতেন···

তারপরই ঘণ্টাখানেক পরে বিপ্লবের আশীর্বাদ হ'য়ে গেলো। একেবারে বড়বাবু তৈরী হয়েই এসেছিলেন। ধান-দূর্বা সোনার

বোতাম প্রভৃতি চাপিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—যাও···এবার আর কোনো ভয় নেই !

একসংগে বেজে উঠলো পাঁচ ছটা শাঁক।

বাড়ীশুদ্ধ উঠলো হাসিতে টলমল করে ; আর চতুর্দিকে ঠাট্টা সুরু হলো—কেমন, বিয়ে করবে না বলেছিলে না ?

সেজকাকা বল্‌লেন—যাও, আমাদের কাজ আমরা ক'রে ফেলেছি, এখন যত পারো তোমার জোর দেখাও গে, যাও···

বিপ্লব একবার এলো নিজের ঘরে, তারপর গিয়ে লুকিয়ে খুল্‌লো বাবার ড্রয়ারটা। তারপর তুলে নিলে সেখান হ'তে বাবার রিভলবারটা। তা'তে টোটা ভরাই ছিলো। সেটা নিয়ে এলো বড়বাবুর সাম্‌নে। বল্‌লে—আপনি বলেছিলেন এবার আর কোনো ভয় নেই···কেমন তো ? কিন্তু ভয় যথেষ্টই আছে···

সেজকাকার দিকে ফির্‌লো সে। বল্‌লে—আপনাদের কায সব করা হয় নি, এখনো একটু বাকী আছে। আমার জোরেরই পরীক্ষা করবো এখন। আর শুনে রেখে দিন—সব কাযই অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করানো যায় না।—বলেই সে বাগিয়ে ধর্‌লো রিভলবারটা বুকের সাম্‌নে। ··আর টিপ্‌লো ঘোড়া।

···একটা অস্ফুট যন্ত্রণা-ধ্বনি ক'রে লুটিয়ে পড়্‌লো মেজেতে।

অতএব চতুর্থবারেতেও তার বিয়ে দিতে কেউ পার্‌লো না···

কিন্তু এইখানেই গল্পের শেষ নয়। আরও একটু আছে।

· · ·

গড়িয়াহাটা রোডের উপর একখানি বাড়ী।

সন্ধ্যাতারা তখন সবেমাত্র আকাশে দেখা দিয়েছে। আর সেই সময়ে বাড়ীর ছাদে উঠ্‌লো একটি তরুণী। অপূর্ব সুন্দরী বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। মা তার অথর্ব, বাবা অন্ধ। মেয়েটির নাম হচ্ছে

সন্ধ্যামণি। তার পরণে বৈধব্যের বেশ।···সর্বাংগ ছেয়ে বৈধব্যের ক্লান্তি। তাকে আজ যারাই দেখ্‌লে, সবাই অবাক্ হ'য়ে গেলো। ভাবলো—এই কুমারী মেয়েটীর বিয়েই বা কবে হয়েছিলো, আর বিধবাই বা সে কবে হলো!

কিন্তু যিনি জান্‌বার তিনি ঠিক্ জানেন—এই সন্ধ্যামণির সংগেই বিপ্লবের বিয়ে হয়েছিল—কবে যেন এক শ্রাবণের সজল-সন্ধ্যায়, কোন্ দূর জনহীন সমুদ্রতীরে!

এই লেখকেরই অন্যান্য পুস্তক :—

অনুবাদ-কাব্য

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (২য় সং)

ব্যঙ্গ কবিতা

বেঙাচি

গাথা-কাব্য

বাঁশীর ডাক

গল্প-গ্রন্থ

সমুদ্রে (২য় সং)
বিপ্লবের বিয়ে

উপন্যাস

প্রেমের সমাধি তীরে (যন্ত্রস্থ)